শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী
উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।
খতীব বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ
মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

- ইসলাহী খুতুবাত (১-১১)
- আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার
- আধুনিক যুগে ইসলাম
- সাম্রাজ্যবাদির আগ্রাসন প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- দারুল উলূম দেওবন্দ-উলামায়ে দেওবন্দ কর্ম ও অবদান
- ইযাহুল মুসলিম [মুসলিম জিলদে সানীর অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ]
- ইযাহুল মুসলিম [মুসলিম জিলদে আওয়ালের অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ]
- দরসে বাইযাবী [শরহে তাফসীরে বাইযাবী বাংলা]
- হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ
- নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- প্রযুক্তির বিনোদন ও ইসলাম
- সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও মুসলিম উম্মাহ
- ফিরআউনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)
- মীম
- সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী
- সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম

সূচিপত্র

দুঃখ-দুর্দশা থেকে উত্তরণের পথ

রামাযান কিভাবে কাটাবেন?

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা : প্রয়োজন মধ্যপন্থা অবলম্বন

সম্পর্ক ঠিক রাখো

মৃতদের দোষচর্চা করো না

তর্ক–বিবাদ ও মিথ্যাচার : প্রয়োজন এড়িয়ে চলা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বীন কিভাবে শিখবে ও শেখাবে?

বিষয় পৃষ্ঠা

ইস্তেখারার সুন্নাত পদ্ধতি

উপকারের বিনিময়ে উপকার

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব

হালাল উপার্জন অন্বেষণ করুন

বিষয় পৃষ্ঠা

গুনাহের অপবাদ থেকে আত্মরক্ষা

বড়কে সম্মান করা

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

মিথ্যা পরিচয় থেকে দূরে থাকুন

দুঃশাসন চেনার উপায়

বিষয় পৃষ্ঠা

আত্মত্যাগ ও পরোপকারের ফযিলত

দুঃখ-দুর্দশা থেকে উত্তরণের পথ

"কিছু কাজ এমন আছে, যেখানে মানুষের হাত থাকে। আবার কিছু আছে এমন, যেখানে মানুষের হাত থাকে না। বরং তা সরাসরি আল্লাহই দান করেন। যেমন সন্তান। সুতরাং মানুষ কিংবা উপায়-উপকরণের কাছে সন্তান লাভের প্রার্থনা করা যায় না। সন্তান চাইলে সরাসরি আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। আর যেসব কাজ আল্লাহ মানুষের মাধ্যমে পূরণ করেন যেমন চাকরি-বাকরি ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও ভরসা করা উচিত আল্লাহরই উপর। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। কেননা, প্রকৃত দাতা তো তিনিই।"

দুঃখ-দুর্দশা থেকে উত্তরণের পথ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًى اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.)। বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে কিংবা কোনো ব্যক্তির কাছে যদি কারও কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে যেন ভালোভাবে অযূ করে। তারপর দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাবাণী ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করার পর যেন এ দু'আটি পড়ে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ —

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ওই নামাযের কথা বলেছেন, যাকে আমাদের পরিভাষায় বলা হয় 'সালাতুল হাজাত'। কোনো ব্যক্তি যদি কঠিন কোনো সমস্যায় কিংবা বিশেষ কোনো সংকটে পড়ে অথবা সে এমন কোনো কাজ করতে চায়, দৃশ্যত যা খুবই কঠিন, তাহলে সে যেন 'সালাতুল হাজাত' পড়ে। তারপর রাসূল (সা.) যে দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন, তা পাঠ করে নিজের প্রয়োজন পূরণের দু'আ করে। তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ যদি ওই কাজের মধ্যে তার জন্য কল্যাণ রাখেন তাহলে অবশ্যই পূরণ হবে। এ কারণেই যে কোনো প্রয়োজন ও সমস্যার সময়ে 'সালাতুল হাজাত' পড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত।

মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য

এ পৃথিবী উপায়-উপকরণের ক্ষেত্র। যে কোনো মানুষ যে কোনো প্রয়োজনে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবে। এটাই স্বাভাবিক। ইসলামও তার বৈধ উপায়-উপকরণ অবলম্বনের অনুমতি দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো এই– একজন কাফের যখন তার

প্রয়োজন পূরণের জন্য কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে, তখন সে এর উপর এতটাই ভরসা করে যে, সে মনে করে, উপায়-উপকরণ যখন ধরেছি, তখন আমার কাজটা অবশ্যই হবে।

চাকরির তদবির

যেমন ধরুন, একজন বেকার লোক, যার প্রয়োজন একটা ভালো চাকরি। এ জন্য সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য সব জায়গাতেই সে দরখাস্ত করছে। পরিচিত কেউ থাকলে তার কাছে সুপারিশের জন্য ছুটে যাচ্ছে। এসবই বাহ্যিক উপকরণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন কাফেরের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কাফের লোকটি এসব উপকরণের উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সে মনে করে, আমি চেষ্টা করবো, যথাস্থানে আবেদন জানাব, সুপারিশ জোগাড় করবো। চাকরি আমার হবেই। এ ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিটা সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ থাকে গৃহীত উপকরণগুলোর উপর। তার আস্থা ও একমাত্র ভরসা এসব উপকরণের উপর। এটাই একজন কাফেরের দৃষ্টিভঙ্গি।

পক্ষান্তরে একজন মুসলমান সে উক্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে। কিন্তু তার দৃষ্টি এসব গৃহীত উপকরণের উপর থাকেনা। সে বিশ্বাস করে, আমার এসব তদবির দ্বারা কিছুই হবেনা। কোনো মাখলুকই মূলত কিছুই করতে পারে না। চেষ্টা-তদবিরের মাঝে যে শক্তি দৃষ্টিগোচর হয়, এসবই আল্লাহর মালিকানায়। এ সবের মালিক আল্লাহ। সুতরাং তিনি চাইলেই এসবের মাধ্যমে আমার উপকার হবে, আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। এ কারণে একজন মুসলমান উপায় ধরার পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! প্রকৃত দাতা তো আপনিই। আমার কর্তব্য হলো চেষ্টা-তদবির করা। সেটা আমি করেছি। এবার আপনি আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দিন।

অসুস্থ ব্যক্তির চেষ্টা

যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লো। এখন তাকে সুস্থ হতে হবে। এজন্য বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতে তাকে ঔষধ সেবন করতে হবে। তার পরামর্শ মেনে চলতে হবে। এসবই বাহ্যিক উপায়-উপকরণ। কিন্তু এখানেও রয়েছে একজন মুসলমান ও একজন কাফেরের ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে একজন কাফেরের পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে ডাক্তার ও তার ব্যবস্থাপকের উপর। ভরসা থাকে তার ঔষধের উপর। আর একজন মুমিন মনে করে,

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে ঔষধ ও ডাক্তারের উপর যেন তোমার বিশ্বাস ও ভরসা না থাকে। বরং তোমার ভরসা যেন আল্লাহর উপরই থাকে। তিনিই সত্যিকারের রোগ নিরাময়কারী। তিনি যদি ঔষধের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা না দেন, তাহলে ঔষধ সেবন করেও কোনো কাজ হবেনা। তাই দেখা যায়, একই ঔষধে একজন সুস্থ হয়ে যায়; কিন্তু আরেকজন হয় না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই ঔষধে একজন সুস্থ হয়, অন্যজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই প্রমাণ যে, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

তদবিরের সঙ্গে দু'আ

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা হলো, তোমরা এ দুনিয়াতে মাধ্যম ও উপকরণ অবশ্যই গ্রহণ করবে। তবে এর উপর ভরসা করোনা। ভরসা করবে মহান আল্লাহর উপর। উপায় অবলম্বন করার পর সবিনয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! বাহ্যত আমার যা করার ছিলো, তা আমি করেছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অর্জন ও প্রয়োজন পূরণ পুরোটাই আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দয়া করে আমার চেষ্টাকে সফল করে দিন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে একটি চমৎকার দু'আ বর্ণিত আছে। দু'আটি এই–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ – (ترمذی ، ابواب الدعوات ، رقم الباب ٣٠)

'হে আল্লাহ! আমার সাধ্য যতটুকু ছিলো, তা আমি অবলম্বন করেছি। তবে ভরসা আপনারই উপর। আপনি আপনার রহমতের উসিলায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।

দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও

একথাগুলোই আমাদের ডাক্তার আবদুল হাই (রহ.) বলতেন এভাবে– দ্বীন মূলত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের নাম। একটু দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও, তাহলে দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। আর দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টালে দুনিয়া দুনিয়াই থাকবে। যেমন– দলমত নির্বিশেষে সকলেই বলে অসুস্থ হলে চিকিৎসা কর। ইসলামে বড় শিক্ষা এটাই। এবার দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে পাল্টাও– চিকিৎসা অবশ্যই গ্রহণ করবো; তবে ভরসা চিকিৎসার উপর নয়– বরং আল্লাহর উপর করবো।

প্রেসক্রিপশনে هُوَالشَّافِىْ লেখা

একটা সময় ছিলো যখন মুসলিম চিকিৎসকগণ তাদের প্রেসক্রিপশনের শুরুতে هُوَالشَّافِىْ কথাটা লিখে দিতেন। এটা ছিলো ইসলামের জীবনাচার। সেকালে মুসলমানদের প্রতিটি কথা ও কাজে ইসলামী ভাবধারার নমুনা পাওয়া যেতো। একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন আর শুরুতে লিখে দিচ্ছেন, সুস্থতা দানকারী আল্লাহ তা'আলা। এর অর্থ হলো, চিকিৎসক চিকিৎসার শুরুতেই এ ঘোষণাপত্র দিয়ে দিচ্ছেন যে, আমার এ ব্যবস্থাপত্র সুস্থতা দেয়ার ক্ষমতা রাখেনা। সুস্থতা দেয়ার মূল মালিক আল্লাহ তা'আলা। চিকিৎসকের এ জাতীয় চিন্তাধারাও নিশ্চয় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে প্রেসক্রিপশন লিখলে সেটাও ইবাদত হবে।

পশ্চিমা সভ্যতার অশুভ প্রভাব

কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার নিয়ন্ত্রণহীন অভিশাপ যেদিন থেকে আমরা গিলতে শুরু করেছি, সেদিন থেকে আমাদের জীবনাচার থেকে ইসলামের প্রতীকগুলো বিদায় নেয়া শুরু করেছে। যে কারণে বর্তমানের মুসলিম চিকিৎসকগণ তাদের ব্যবস্থাপত্রের শুরুতে هُوَالشَّافِىْ কথাটি লিখেন না। বিসমিল্লাহও লিখেন না। বরং রোগী দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ঔষধের নাম লেখা শুরু করেন। আল্লাহর প্রতি ভরসা করার কথা চিন্তাও করেন না। এর মূল কারণ হলো, আমরা আমাদের বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান পেয়েছি কাফেরদের মাধ্যমে, যাদের মন-মানস আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাসী নয়। উপকরণের উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাদের বস্তুর উপর। আল্লাহর উপর তাদের কোনো ভরসাই নেই।

ডাক্তার হও, তবে মুসলমান ডাক্তার হও

বিজ্ঞান শিক্ষায় আল্লাহ কোনো বাধা দেননি। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান কারো পৈত্রিক সম্পদ নয়। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এর মালিক নয়। তাই মুসলমানরাও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। চাইলেই তারাও পারে এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে। ইসলামের পক্ষ থেকে এতে কোনো বাধা নেই। তবে শর্ত আছে অবশ্যই। শর্ত হলো, নিজের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করতে হবে। ইসলামের সমূহ প্রতীক সংরক্ষণ করতে হবে। বিজ্ঞানচর্চায় ঈমান-বিকাশের স্বাক্ষর রাখতে হবে। এমন তো নয় যে, চিকিৎসক হলে 'হুয়াশ-শাফী' তথা 'আল্লাহই সুস্থতাদানকারী' লেখাটা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। একজন

চিকিৎসাবিজ্ঞান অর্জন করে তার ঈমান-বিশ্বাসের এই চর্চাটুকু করতে পারবে না-এমন তো নয়। এটা লিখলেই তার চিকিৎসাবিজ্ঞান গোল্লায় যাবে-এমনও তো নয়। কিংবা তাকে সেকেলে বলা হবে-এমনটিও নয়। সুতরাং ডাক্তার হও-কোনো বাধা নেই। তবে মুসলমান ডাক্তার হও। নিজের ঈমানের বিকাশ ঘটাও। নিজের ব্যবস্থাপত্রে এর স্বাক্ষর রাখো।

দৈব ঘটনা

বড়-বড় চিকিৎসাবিজ্ঞানীও অনেক সময় আল্লাহর ক্ষমতা সরাসরি দেখেন। তারা দেখেন, অনেক ক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। অকার্যকর হয় তাদের যাবতীয় চেষ্টা-তদবির। তখন তারা বলে, আমাদের বাহ্যিক বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তারা এরূপ ঘটনাকে আল্লাহর কুদরত না বলে বরং বলে- এটা এক দৈব ঘটনা।

কোনো কাজ দৈবক্রমে হয় না

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, বর্তমানের মানুষ সাধারণ যুক্তিবিরোধী ঘটনাকে বলে 'দৈব ঘটনা'। অথচ "দৈব ঘটনা" বলতে কিছু নেই। এ পৃথিবীর সবকিছুই ঘটে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়। তাঁরই ক্ষমতা বলে সবকিছু হয়। কারণ ছাড়া কোনো কিছু ঘটলে কিংবা কোনো ঘটনার পেছনে যুক্তি খুঁজে না পেলে তা দৈবক্রমে হয়েছে বলা উচিত নয়। কারণ, পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনাও সঞ্চালিত হয় আল্লাহর ইচ্ছায়। সুতরাং বলতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এমনটি হয়েছে। এই যে ধরুন, ঔষধের মাঝে কাজ করার ক্ষমতা তো আল্লাহই দেন। সুতরাং ঔষধে কাজ না হলে এটাও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। এতদুভয়ের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো হাত নেই। সবকিছুই তো আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে।

সকল উপায়-উপকরণ তাঁরই অধীনে

এই জন্যই বলি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই মূল বিষয়। একজন বিশ্বাসী বান্দার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই আসল। একজন বিশ্বাসী বান্দার দৃষ্টিভঙ্গি হবে, উপায়-উপকরণ নয় বরং মূলত সবকিছু করেন আল্লাহ তা'আলা। সবকিছু চলে তাঁরই মালিকানায়। তবে তিনি আমাদেরকে উপায়-উপকরণ গ্রহণের শুধু অনুমতিই নয়, বরং নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, আমাদের জন্যই তিনি পার্থিব জগতের এসব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তবে আমাদের জন্য এখানে তিনি একটি

পরীক্ষার বিষয় রেখে দিয়েছেন যে, আমাদের দৃষ্টি কি এসব উপায়-উপকরণের উপর পড়ে থাকে কি-না, এগুলো অতিক্রম করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি মহান আল্লাহর উপর? আল্লাহর রাসূল (সা.) মূলত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তনই সাধন করেছিলেন। তিনি এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে উপায়-উপকরণের প্রতি নয়; বরং এগুলোর স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি। তাই সাহাবায়ে কেরামও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতেন। আল্লাহর নির্দেশ হিসাবেই তাঁরা এটা করতেন। আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রাখতেন আল্লাহর উপর। বান্দা যখন উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়, তখনই আল্লাহ তা'আলা বান্দার হাতে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান।

হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ (রা.)-এর বিষপানের ঘটনা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ। সিরিয়ার একটি কেল্লা অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। দীর্ঘ অবরোধের পর কেল্লাবাসী দিশেহারা হয়ে পড়লো এবং তারা সন্ধির প্রস্তাব দিলো। এ জন্য তারা নিজেদের দলপতিকে খালিদ (রা.)-এর কাছে পাঠালো। দলপতি যখন খালিদ (রা.)-এর কাছে এলো, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, দলপতির হাতে ছোট্ট একটি শিশি। জিজ্ঞেস করলেন, এই শিশির মধ্যে কী? কেন এনেছো এটি? সে জানালো, এটা বিষের শিশি। এজন্য নিয়ে এসেছি–যদি সন্ধি-আলোচনায় সফল হই, তাহলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আমার এ ব্যর্থ মুখ নিজের জাতিকে দেখাবোনা। বরং বিষ পান করে আত্মহত্যা করবো।

দ্বীনি দাওয়াতই ছিলো সাহাবায়ে কেরামের আসল কাজ। হযরত খালিদ ইবনে ওলিদ (রা.)ও তাই মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিলেন, দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার এই তো মোক্ষম সময়। এই ভেবে তিনি দলপতিকে বললেন, একজন মানুষ এ বিষ পান করার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে–এটাই তো তোমার বিশ্বাস? দলপতি বললো, অবশ্যই। আমার একশ ভাগ বিশ্বাস এর বিন্দুপরিমাণও যদি কেউ পান করে, সঙ্গে-সঙ্গে সে মারা যাবে। কারণ, এ বিষ সম্পর্কে চিকিৎসকগণ বলেছেন, আজ পর্যন্ত এ বিষের স্বাদের বিবরণ কেউ দিতে পারেননি। কারণ, এটির বিন্দুপরিমাণ পান করার পর সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছে। এর স্বাদটা কেমন তা বলে যাওয়ার অবকাশ পায়নি। তাই আমি শিওর যে, এ বিষ পান করলে সঙ্গে-সঙ্গে আমি মারা যাবো।

খালিদ ইবনে ওলিদ (রা.) দলপতিকে বললেন, আচ্ছা! যে বিষের উপর তোমার এত অগাধ বিশ্বাস, তা একটু আমাকে দাও তো! দলপতি শিশিটি খালিদ (রা.) এর হাতে দিলো। তিনি শিশিটি নিয়ে বললেন, দেখো, আসলে জগতের কোনো কিছুতেই কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ যখন কোনো কিছুর মধ্যে কোনো ক্ষমতা দান করেন, তখনই সে ক্রিয়াশীল হতে পারে। এর পূর্বে নয়। আমি আল্লাহ তা'আলার নামে এ দু'আ পড়ে–

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –

তোমার এ বিষের শিশি পুরোটাই পান করছি। দেখো তো, আমার মৃত্যু হয় কিনা?

দলপতি বললো, দেখুন, আপনি কিন্তু নিজের উপর অবিচার করছেন। এটা খুবই মারাত্মক বিষ। এর একটি ফোঁটাও যদি কারো জিহ্বায় পড়ে, তাহলে নির্ঘাত সে মারা যাবে। কাজেই আপনি যা করার ভেবে-চিন্তে করুন।

খালিদ (রা.) বললেন, 'ইনশাআল্লাহ' আমার কিছু হবেনা। এই বলে তিনি দু'আটি পড়ে পুরো এক শিশি বিষ পান করে ফেললেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের কারিশমা দেখিয়ে দিলেন। দলপতি বিস্ময়ঝরা দৃষ্টিতে দেখলো, খালিদ (রা.) এর কিছুই হলোনা। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলো।

সকল কাজ আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে

সারকথা, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে চলে– এ বিশ্বাস সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিলো। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এ পৃথিবীর কোনো কিছুই অনু পরিমাণও সঞ্চালিত হয় না। এ বিশ্বাসে তাঁরা এতটাই উজ্জীবিত ছিলেন, তাঁরা মনে করতেন এসব উপায়-উপকরণ মূলত ক্ষমতাহীন। এগুলোর নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ যখন এ বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে, তখনই আল্লাহ তাঁর কুদরতের কারিশমা দেখান। আল্লাহর স্বভাব হলো, বান্দা উপায়-উপকরণের সঙ্গে যত বেশি জড়াবে, আল্লাহ তাকে ততবেশি এগুলোর উপর নির্ভরশীল করে দেন। আর যত বেশি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তত বেশি তিনি উপায়-উপকরণ থেকে তাকে অমুখাপেক্ষী করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতিটি পদক্ষেপেই এ বিষয়টি দেদীপ্যমান ছিলো।

প্রিয় নবী (সা.)-এর ঘটনা

প্রিয় নবী (সা.) একবার কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। পথে তাঁবু ফেললেন। তিনি একা একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়লেন। তাঁর জন্য পাহারার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। আর এটাকেই এক কাফির মহাসুযোগ হিসাবে লুফে নিলো। কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেলো প্রিয় নবী (সা.)-এর একেবারে মাথার কাছে। ফলে প্রিয় নবীজীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন, তাঁরই মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন কাফির খোলা তরবারি নিয়ে। তাঁর চোখ খোলামাত্র কাফির লোকটি বললো, হে মুহাম্মদ! এ মুহূর্তে আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে কে? লোকটি ভেবেছিলো, নবীজী (সা.) একাকী, আশেপাশে পাহারাদার নেই, সুতরাং তিনি ঘাবড়ে যাবেন, নিজেকে রক্ষা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠবেন। কিন্তু সে আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করলো, নবীজী (সা.)-এর মাঝে আত্মরক্ষার কোনো ব্যকুলতা নেই। অস্থিরতার কোনো ছাপ নেই। বরং তিনি শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আল্লাহ!

নবীজী (সা.) অঙ্গভঙ্গিতে এহেন দৃঢ়তার ঝলক দেখে সে নিজেই এবার ঘাবড়ে গেলো। তার দেহ-মন কেঁপে উঠলো। কাঁপা হাত থেকে তরবারিটি ছিটকে পড়লো। প্রিয় নবী (সা.) উঠে শান্তভাবে তরবারিটি তুলে নিলেন এবং বললেন, এবার তোমাকে বাঁচাবে কে?

মূলত এ মুহূর্তে এটাই ছিলো দাওয়াতের পদ্ধতি। নবীজী (সা.) বলতে চেয়েছেন, দেখো! তোমার আস্থা ও নির্ভরতা ছিলো তরবারিটার উপর– তরবারির স্রষ্টার উপর নয়। পক্ষান্তরে আমার ভরসা ছিলো তরবারির উপর নয়, বরং স্রষ্টার উপর।

এটাই ছিলো নবীজী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এ আদর্শের উপরই গড়ে তুলেছিলেন। এর ফলে দেখা গেছে, সাহাবায়ে কেরামও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতেন; কিন্তু এর উপর ভরসা করতেন না। তাঁদের ভরসা ও নির্ভরতা হতো একমাত্র আল্লাহর উপর।

প্রথমে উপায়-উপকরণ তারপর তাওয়াক্কুল

এক সাহাবীর ঘটনা। নবীজী (সা.)-এর খেদমতে এলেন এবং সবিনয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি একজন রাখাল, অনেক সময় উট নিয়ে মাঠে যাই। নামাযের সময় হয়ে যায়। আমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবো, তখন উট কী করবো? বেঁধে নিবো, না আল্লাহর উপর ভরসা করে ছেড়ে রেখে নামাযে দাঁড়াবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাব দিলেন–

اِعْقِلْ سَاقَهَا وَتَوَكَّلْ

প্রথমে উটের পায়ে রশি লাগাও। তারপর আল্লাহর উপর ভরসা কর।

এখানে রাসূল (সা.) ভরসা করতে বলেছেন উটকে ছেড়ে রেখে নয়, বরং বেঁধে রেখে। কারণ, বেঁধে রাখার পর উটের রশিটা ছিঁড়ে যেতে পারে কিংবা রশিটা তুমি ভুলভাবেও বাঁধতে পার। তাই এর উপর ভরসা করো না। ভরসা কর আল্লাহর উপর। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মুমিন উপায়-উপকরণ গ্রহণ করলেও ভরসা করে মহান আল্লাহর উপর। এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা– প্রথমে উপায়-উপকরণ গ্রহণ কর, তারপর বলো–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ –

"হে আল্লাহ! আমি আমার চেষ্টা সম্পাদন করেছি। ভরসা তো আপনারই উপর।"

মাওলানা রূমী (রহ.) আলোচ্য হাদীসটি একটি চরণের মাধ্যমে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়–

بہ توکل پائے اشتر ببند

'প্রথমে উটের পায়ে দড়ি বাঁধো, তারপর তাওয়াক্কুল কর।'

কাজ হওয়ার বিষয়টি যদি সুনিশ্চিত হয়

হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, মানুষ মনে করে, যেখানে উপায়-উপকরণের মাধ্যমে কাজ হওয়া না হওয়ার বাহ্যিক সম্ভাবনা থাকে, শুধু সেক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করা উচিত এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত। কিন্তু যেখানে বিষয়টি ঘটার সম্ভাবনা নয়, বরং ঘটা সুনিশ্চিত সেখানে তাওয়াক্কুল করা ও আল্লাহর কাছে চাওয়ার বিশেষ কোনো গরজ নেই। যেমন দস্তরখানে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, পেটেও ক্ষুধা আছে, ইচ্ছা করলেই খেতে পারি। এখানে তাওয়াক্কুল কিংবা দু'আ করার প্রয়োজন নেই।

এটাই তাওয়াক্কুলের প্রকৃত ক্ষেত্র

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, অথচ এটাই তাওয়াক্কুলের মূল ক্ষেত্র। এটাই আল্লাহর কাছে দু'আ করার আসল স্থান। কারণ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা ঘটা সুনিশ্চিত, এমন ক্ষেত্রে যদি কেউ আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তখন এর অর্থ হবে, আমার সামনে উপস্থিত এসব বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর আমার কোনো ভরসা নেই। বরং হে আল্লাহ! আপনারই উপর আমার ভরসা। আপনার

দেয়া রিযিক, আপনার সৃষ্টি, আপনার দেয়া শক্তি ও আপনারই অনুগ্রহের উপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

সুতরাং খাবার সামনে এলে এ দু'আ করবে– হে আল্লাহ! এ খাবার আমাকে পরিপূর্ণ কল্যাণের সাথে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। কেননা, যদিও খাবার সামনে উপস্থিত, হাত বাড়ালে মুখে নেয়া যাবে, কিন্তু ভুলে যেও না যে, আল্লাহ যদি না চান, তাহলে পাতা খাবারও তিনি কেড়ে নিতে পারেন। পৃথিবীতে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে– খাবার সামনে আনা হয়েছে। শুধু হাত বাড়াতে দেরি। এরই মধ্যে এমন কিছু ঘটেছে, যার ফলে হাতের লোকমাটিও পড়ে গেছে। যেমন খাবার তেমনি পড়ে আছে। সুতরাং খাবার সামনে থাকা অবস্থায়ও আল্লাহর কাছে দু'আ করা চাই– হে আল্লাহ! এ খাবার গ্রহণের তাওফীক আমাকে দান করুন।

উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

আলোচনার শুরুতে যে হাদীসটি আপনাদের সামনে পেশ করেছি, তাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ শিক্ষাই দিয়েছেন। যদি তোমাদের কারও আল্লাহর কাছে কিংবা কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'টি কথা বলেছেন। কেননা, কিছু কাজ আছে এমন, যেখানে মানুষের হাত থাকে। আবার কিছু কাজ আছে, যেখানে মানুষের কোনো হাত থাকে না। বরং তা সরাসরি আল্লাহই দান করেন। যেমন সন্তান। সন্তানদানে মানুষের কোনো হাত নেই। সুতরাং কোনো মানুষ কিংবা উপায়-উপকরণের কাছে সন্তান লাভের দু'আ করা যায় না। বরং সন্তান চাইলে সরাসরি আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। আবার কিছু কাজ আছে এমন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাধ্যমে পূরণ করেন। যেমন চাকরি-বাকরি ইত্যাদি। এ উভয় ক্ষেত্রেই মূলত ভরসা করা উচিত আল্লাহরই উপর। তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। কেননা, তিনিই তো প্রকৃত দাতা।

ভালোভাবে অযু করবে

সারকথা হলো, এখন যদি তোমার হাতে সময় থাকে আর তোমার প্রয়োজনীয় কাজটিও এক্ষুণি জরুরি হয়, তাহলে এর জন্য সালাতুল হাজাত পড়। সালাতুল হাজাতের নিয়ম আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) উল্লেখ করেছেন এভাবে– প্রথমে ভালোভাবে অযু করবে। কোনো রকম নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের সূচনা করতে যাচ্ছ এ ভাবনা মাথায় রেখে উত্তমরূপে অযু করবে। অযুর প্রতিটি সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমরা তো সব

সময় অযু করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুব তাড়াহুড়ো করে ফেলি। ফলে অযু অবশ্য আদায় হয়ে যায়; কিন্তু অযুর যে নূর ও বরকত রয়েছে, তা থেকে বঞ্চিত থাকি।

অযুর মাধ্যমে গুনাহগুলোও ধোয়া হয়ে যায়

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো বান্দা অযু করে এবং এ উদ্দেশ্যে মুখ ধোয়, তখন তার চেহারার গুনাহগুলো পানির সঙ্গে ঝরে পড়ে। যখন সে ডান হাত ধোয়, তখন তার হাতের গুনাহগুলো এবং যখন সে বাম হাত ধোয়, তখন বাম হাতের গুনাহগুলোও অযুর পানির সঙ্গে ঝরে পড়ে যায়। এভাবে অযু করার সময় যতগুলো অঙ্গ ধোয়া হয়, ততগুলো অঙ্গের কৃত গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়। এজন্য খুব গুরুত্বসহ আদব ও সুন্নাতগুলোর প্রতি যত্ন নিয়ে অযু করা চাই।

আমাদের ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, অযু করার সময় ভাববে, যেমন চেহারা ধোয়ার সময় এটা ভাববে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুসংবাদ মতে আমার চেহারা দ্বারা কৃত গুনাহগুলো ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। এখন হাত ধুচ্ছি আর হাত দ্বারা কৃত গুনাহগুলো ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। পা ধোয়ার সময়ও এরূপ ভাবনা কর। এ ধরনের ভাবনা যে অযুতে থাকবে, সেই অযু এবং এরূপ ভাবনা যে অযুতে থাকবে না, সেই অযুর মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে। এরূপ ভাবনাসমৃদ্ধ অযুর মাঝে রয়েছে অন্যরকম এক মজার অনুভূতি।

অযু করার সময় দু'আ

অযুর ক্ষেত্রে কিছু সুন্নাত ও আদব রয়েছে। যেমন অযু করার সময় কেবলামুখী হয়ে বসা, প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া, অযুর মাসনূন দু'আগুলো পড়া, যেমন– এই দু'আ পড়া–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْدَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ –

(ترمذى، كتاب الدعوات ، باب دعاء يقال فى الليل)

কালেমায়ে শাহাদাত পড়া–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُه –

এবং অযুর শেষে এই দু'আ পড়া–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

(ترمذى، كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء)

সালাতুল হাজতের বিশেষ কোনো নিয়ম নেই

সারকথা হলো, সালাতুল হাজতের উদ্দেশ্যে মনোযোগসহ অযু করবে। এ নামায পড়ার জন্য বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। সাধারণভাবে অন্যান্য নামায যেভাবে পড়া হয়, এটাও ওইভাবেই পড়বে। অনেকে বিভিন্ন নামাযের জন্য বিভিন্ন নিয়ম বানিয়ে রেখেছে। যেমন অমুক নামাযে প্রথম রাকাতে এই সূরা এবং দ্বিতীয় রাকাতে এই সূরা পড়া ইত্যাদি। এসব নিয়ম মনগড়া ও ভিত্তিহীন। সালাতুল হাজতের নামাযও এরকমই। রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাতুল হাজাত পড়ার যে নিয়ম বলেছেন, তাতে এ ধরনের বিশেষ কোনো নিয়মের বিবরণ পাওয়া যায় না। কোনো কোনো বুযুর্গ, যেমন– ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, সালাতুল হাজাতের প্রথম রাকাতে সূরা আলাম নাশরাহ' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা নাছর' পড়তে পার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ দুটি সূরা দিয়ে পড়লে অধিক কাজ হয়। সুতরাং এটাকে সুন্নাত মনে করা যাবে না। সুন্নাত মনে করলে এটাও বিদআত হয়ে যাবে। বুযুর্গদের অভিজ্ঞতা মনে করে বরকতের জন্য এরূপ আমল করা যাবে– সুন্নাত মনে করে নয়।

নামাযের নিয়ত

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। তাহলো, আজকাল মানুষ প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা-আলাদা নিয়ত খুঁজে থাকে। তারা মনে করে, ওই নিয়তটা উচ্চারণ না করা হলে নামাযই হবে না। এ কারণে এসে তারা বারবার প্রশ্ন করে, অমুক নামাযের নিয়ত কিভাবে হবে?

মনে রাখবেন, নিয়ত কোনো শব্দের নাম নয়। নিয়ত অর্থ অন্তরের সংকল্প। সুতরাং আপনি যখন ঘর থেকে জোহর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন, তখন আপনার ওই সংকল্পটাই নিয়ত। এখানে মুখে আলাদা করে নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরি নয়।

দু'আর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা

ভালোভাবে অযু করে দু'রাকাত নামায পড়ার পর আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। দু'আ কিভাবে করবে এটাও রাসূলুল্লাহ (সা.) বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, সালাম ফিরানোর সাথে সাথে দু'আ শুরু করবে না। বরং এর আগে আল্লাহর প্রশংসা করবে। আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে। তারপর সবিনয়ে দু'আ করবে।

হাম্‌দ কেন প্রয়োজন?

প্রশ্ন হলো, দু'আর পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা কেন করতে হয়? এখানে এর কী দরকার? উলামায়ে কেরাম এর কারণ হিসাবে বলেছেন, এ দুনিয়াতে মানুষ যখন রাজা-বাদশাহর কাছে নিজের কোনো প্রয়োজন নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন সে প্রয়োজনীয় বস্তুটি চাওয়ার পূর্বে রাজা-বাদশাহর সম্মানে কিছু কথা বলে, যেন বাদশাহ তার কথায় খুশি হয়ে তার মনের আশা পূর্ণ করে দেন। সুতরাং দুনিয়ার একজন সাধারণ বাদশাহর দরবারের রীতি যদি এমন হয় যে, তার কাছে কিছু চাইতে হলে এর পূর্বে তার প্রশংসা করতে হয়, তাহলে যিনি সকল বাদশাহরও বাদশাহ, তাঁর কাছেও কিছু চাইতে হলে এর পূর্বে তাঁর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি গভীর শুকরিয়া পেশ করা উচিত। যেন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমার প্রার্থনাকে মঞ্জুর করে নেন।

দুঃখ-বেদনাও আল্লাহর নেয়ামত

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) একবার নিজের মজলিসে বলছিলেন, মানুষের জীবনে যেসব দুখ-কষ্ট-বিপর্যয় আসে, গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে মূলত এগুলোও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। অন্তর্চক্ষু যাঁদের আছে, তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।

প্রশ্ন হলো, এগুলো কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত হয়? এর জবাব হলো, হাদীস শরীফে এসেছে, যারা দুঃখ-দুর্দশায় সবর করে, আখিরাতের জীবনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর বিনিময়ে দান করবেন মহাপুরস্কার। এ কারণে এ পৃথিবীতে যারা খুব একটা বিপর্যয়ে পড়েনি, আখিরাতে তারা আফসোস করবে। বলবে, আহা! পৃথিবীতে যদি আমরা কঠিন বিপদে পড়তাম। আমাদের গায়ের চামড়া যদি কাঁচি দিয়ে কুটি-কুটি করে ফেলা হতো তারপর সবর করতে পারতাম, তাহলে আজ ধৈর্যশীলদের মতো আমরা বিপুল পুরস্কার পেতাম।

হাজী সাহেব (রহ.)-এর বিস্ময়কর দু'আ

হযরত হাজী সাহেব (রহ.) যখন এ বিষয়ে আলোকপাত করছিলেন, ঠিক তখনই এক ব্যক্তি এলো। লোকটি নানা রোগ- শোকে জর্জরিত ছিলো। সে এসে হাজী সাহেবকে বললো, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহ যেন এতসব মুসিবত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে দেন। মজলিসে হযরত থানবী (রহ.)ও

উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা উপস্থিতরা তখন কৌতূহলবোধ করছিলাম যে, হযরত এখন কী করেন। কারণ, হযরত তো এইমাত্র বললেন, দুঃখ-বেদনা, বিপদ-আপদও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। আর এ ব্যক্তি দু'আ চাইছে তার দুঃখ-দুর্দশা যেন দূর হয়। এখন হাজী সাহেব যদি লোকটির কথা মত দু'আ করেন, এর অর্থ হবে, আল্লাহর নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার দু'আ তিনি করলেন। আর যদি দুঃখ-ব্যথা বহাল থাকার জন্য দু'আ করেন, তবে তো লোকটি দু'আ চাইতে এসে আরো বিপদে পড়লো।

হযরত হাজী সাহেব (রহ.) সঙ্গে-সঙ্গে হাত উঠালেন, দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! বিপদ-আপদ, দুঃখ-বেদনা এসবই প্রকৃতপক্ষে আপনারই নেয়ামত। কিন্তু আল্লাহ গো! আমরা তো দুর্বল। তাই আমাদের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে দুঃখ- বেদনা নামক এ নেয়ামতকে সুস্থতার নেয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

বিপদের সময় নেয়ামতের কথা মনে রাখা চাই

মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন সে ভুলে যায় তার প্রতি আল্লাহর কত দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। যেমন– যার পেটে ব্যথা, সে একেই সবচে বড় বিপদ মনে করে। সে একথা ভাবে না, আল্লাহ তো আমাকে জিহ্বা দিয়েছেন, সেটাও তো সুস্থ। আমার দাঁতগুলোতে তো কোনো ব্যথা নেই। আমার সারা শরীর তো সুস্থ। ব্যথা তো শুধু পেটে। এখন এ পেটের পীড়ার জন্য অবশ্যই দু'আ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহ যে আমাকে আরো অনেকগুলো নেয়ামত দিয়েছেন, এর জন্যও দু'আ করতে হবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

হযরত মিয়াঁ সাহেব এবং নেয়ামতের শুকরিয়া

আব্বাজানের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন মিয়াঁ আসগর হুসাইন (রহ.)। জন্মগত বুযুর্গ ছিলেন তিনি। তাঁর বুযুর্গি ছিলো বিস্ময়কর। আব্বাজান বলেন, একবার সংবাদ পেলাম আমার এ ওস্তাদ অসুস্থ– জ্বরে ভুগছেন। আমি দেখতে গেলাম। গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। তাঁকে খুবই বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিলো। আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! কেমন বোধ করছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার চোখগুলো সুস্থ, কানদ্বয়ও রোগমুক্ত। জিহ্বাটাও কাজ করছে ঠিকমতো। এভাবে তিনি শরীরের প্রতিটি সুস্থ অঙ্গের নাম ধরে-ধরে এর বিনিময়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। সবশেষে বললেন, শরীরের জ্বরটা শুধু একটু জ্বালাচ্ছে। আল্লাহ যেন সুস্থ করে দেন এ দু'আ কর। একেই বলে কৃতজ্ঞ বান্দা। কষ্টে জর্জরিত অবস্থায়ও আল্লাহর

নেয়ামতের কথা স্মরণ করে। যে কারণে কঠিন সমস্যার মাঝেও নিজের মাঝে স্বস্তি বোধ করে।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন, দু'আর পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করবে। তাঁর কাছে দু'আ করার পূর্বে, নিজের অভাব পূরণের কথা বলার পূর্বে বর্তমান নেয়ামতগুলোর কথা মনে রাখবে এবং এর জন্য তাঁর শোকর আদায় করবে।

আল্লাহর প্রশংসার পর দুরূদ শরীফ কেন?

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) উপর দুরূদ পাঠাবে। প্রশ্ন হলো, দু'আর সময় দুরূদ কেন? আসল কথা হলো, রাসূল (সা.) উম্মতের জন্য ছিলেন সীমাহীন দয়াবান। তিনি চাইতেন, উম্মতের দু'আ যেন কোনো অবস্থাতেই বৃথা না যায়। আর দুরূদবিহীন দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু দুরূদসমৃদ্ধ দু'আ কবুল হওয়ার গ্যারান্টি আছে। আমরা যখন দুরূদ পড়ি–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা বলি– হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবার-পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

এটা এমন এক প্রার্থনা, যা কখনও ব্যর্থ হয় না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তো এমনিতেই রহমত নাযিল হতে থাকে। কিন্তু তিনি চেয়েছেন, আমার উম্মত যেন দু'আ করার পূর্বে আমার প্রতি দুরূদ পড়ে। কেননা দুরূদ তো নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, সেই সাথে বান্দার প্রার্থনাকেও প্রত্যাখ্যান করবেন না। কেননা, আল্লাহর মত মহান দয়াবানের ক্ষেত্রে এটা ভাবা যায় না যে, তিনি দু'আর এক অংশ কবুল করবেন এবং অন্য অংশ প্রত্যাখ্যান করবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হাদিয়ার বিনিময়

ডা. আবদুল হাই (রহ.) এর দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলতেন, হাদীস শরীফে রাসূল (সা.)-এর উপর যখনই যে কোনো দুরূদ পাঠ করে, তখনই ফেরেশতাগণ তা রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে যায় এবং আবেদন করে, আপনার অমুক উম্মত হাদিয়াস্বরূপ আপনার প্রতি এ দুরূদখানা পাঠিয়েছে। আর রাসূল (সা.) যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর স্বভাব ছিলো, তাঁকে কেউ কোনো কিছু হাদিয়া দিলে তিনি হাদিয়াদাতাকে বিনিময়স্বরূপ অবশ্যই কিছু হাদিয়া দিতেন।

উক্ত দুটি বিষয়কে সামনে রাখলে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে দুরূদ পাঠানোর পর তিনি এর বিনিময় দিবেন না–এটা কখনও হতে পারে না; বরং অবশ্যই তিনি এর বিনিময় দিবেন। আর সে বিনিময়টা হবে এই–তিনি ওই উম্মতের জন্য দু'আ করবেন যে, হে আল্লাহ! আমার এ উম্মত যে আমার খেদমতে দুরূদ পাঠাচ্ছে, আপনি তার অমুক সংকট ও দুর্দশা দূর করে দিন। হে আল্লাহ! তার সমস্যার সমাধান করে দিন। আর এর বরকতে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ উম্মতের প্রার্থনা কবুল করে নিবেন। সুতরাং দু'আ করার পূর্বে দুরূদ শরীফ পাঠ কর।

সালাতুল হাজাতের দুআ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তারপর দু'আর এ শব্দগুলো বলবে–

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ

এখানে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণবাচক নাম নেয়া হয়েছে। এ বরকতময় নামগুলোর বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। জানেন আমাদের নবীজী (সা.)ও। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমাদেরকে এ শব্দগুলো বলতে বলেছেন, তখন আমরা এ শব্দগুলোই বলবো। আমরা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবো না। এ শব্দগুলোর মধ্যে অবশ্যই কোনো রহস্য আছে। যে কারণে আমাদের প্রয়োজন পূরণ হবে। শব্দগুলোর অর্থ হলো–আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যিনি ধৈর্যশীল ও দানশীল। ধৈর্য ও দান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দুটি গুণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্ভবত এ দুটি বিশেষ গুণের জন্য বলেছেন, বান্দা যেন শুরুতেই একথা স্বীকার করে নেয়, হে আল্লাহ! আমি তো এই উপযুক্ত নই যে, আমার দু'আ কবুল করবেন। আমার গুনাহর শেষ নেই। কিন্তু আপনি যেহেতু মহান ধৈর্যশীল, এ কারণেই আবেগ আপনাকে তাড়িত করতে পারে না। আপনি ফয়সালা করে আপনার মহান ধৈর্যগুণের ভিত্তিতেই। আমি আপনার সেই গুণের উসিলায় দু'আ করছি। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। উপরন্তু রহমতও দান করবেন।

তারপর বলেছেন–

سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ পবিত্র। সুমহান আরশের মালিক।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন সব জিনিস প্রার্থনা করছি, যেগুলোর কারণে আপনি দয়া করেন।

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ

আমি আপনার নিশ্চিত ক্ষমা চাই।

وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ

আমি প্রার্থনা করছি, যেন সকল কল্যাণ থেকে একটি অংশ আমিও পাই।

وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ

সকল গুনাহ থেকে নিরাপত্তা চাই।

لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ

আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন।

وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ

আমার সকল অস্থিরতা ও দুর্দশা দূর করে দিন।

وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ

'হে সারা জাহানের অধিপতি! আপনার মর্জি মতো আমার সব প্রয়োজন পূর্ণ করে দিন।

উক্ত দু'আটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুখস্থ রাখা জরুরি। এ দু'আ পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আশা করি তিনি কবুল করে নিবেন।

প্রত্যেক প্রয়োজনকালে সালাতুল হাজাত পড়বে

হাদীশ শরীফে এসেছে, প্রিয় নবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিলো–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَنَهُ اَمْرٌ صَلّٰى –

(ابو داود ، كتاب الصلاة)

যে কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখী হলে তিনি প্রথমে নামায পড়তেন। তারপর আল্লাহর কাছে বিপদমুক্তির জন্য দু'আ করতেন। তাই এটা হওয়া উচিত একজন মুসলমানের আদর্শ। এটাই নবীজী (সা.)-এর তরীকা।

সময় হাতে না থাকলে শুধু দু'আ করবে

আলোচ্য বিশদ বিবরণ তখন প্রযোজ্য হবে, যখন দু'রাকাত নামায পড়ার মত সময় হাতে থাকবে। কিন্তু বিপদকালে যদি এতটুকু সময় না পাওয়া যায়, তাহলে নামায না পড়ে শুধু দু'আর উক্ত শব্দগুলো বলে নিজের প্রয়োজন পূরণের দু'আ করবে। প্রতিটি প্রয়োজন আল্লাহর কাছেই পেশ করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, এমনকি জুতার একটি ফিতার প্রয়োজন হলেও আল্লাহর কাছে চাইবে। মূলত ছোট প্রয়োজন কিংবা বড় প্রয়োজন তো আমাদের দৃষ্টিকোণে। আল্লাহর কাছে কোনো ছোট-বড় নেই। জুতার ফিতা খোয়া যাওয়া কিংবা রাজত্ব চলে যাওয়া তাঁর কাছে এক সমান। তিনি সব প্রয়োজনই পূরণ করতে পারেন। اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ তিনি সবকিছুর উপরই শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। তাঁর ক্ষমতা প্রতিটি জিনিসের উপর সমান। তাঁর কাছে কোনো জিনিসই কঠিন নয়। তাই বড় হোক-ছোট হোক প্রতিটি বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে।

দুঃখ-দুর্দশা এবং আমাদের অবস্থা

বর্তমানে সবাই অস্থির। জান-মাল আজ নিরাপদ নয়। শঙ্কা, ভীতি, অস্থিরতা ও অশান্তি আজ সকলকেই তেড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা কতজনই-বা আছি যে, সালাতুল হাজাত পড়ে সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। ভুল স্বীকার করে এবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

রামাযান কিভাবে কাটাবেন?

"এগারটি মাস তোমাদের কাজ-কর্ম ছিলো লাগামহীন। পার্থিব জগতের রূপ-রস-গন্ধে এতটাই মোহাবিষ্ট ছিলে যে, সে কারণে নিজেদের তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতির বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল করে ফেলেছ। এবার ফিরে আস। এ মাসে তোমরা নিজেদের তাকওয়ার এ বৈশিষ্ট্যকে জীবন্ত ও শক্তিমান করতে সচেষ্ট হও। শুধু রোযা রাখলে আর তারাবীহ পড়লেই এ মাসের করণীয় শেষ হয়ে যায় না।"

রামাযান কিভাবে কাটাবেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۝(سورة البقرة ١٨٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

রামাযান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে লোকটি এ মাস পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (সূরা বাক্বারাহ : ১৮৫)

রামাযান : এক মহান নেয়ামত

সম্মানিত সুধী ও প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

রামাযানুল মুবারক আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নেয়ামত। এ মাসের প্রকৃত মর্যাদা ও তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করবো কিভাবে? কারণ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ঘুরঘুর করি দুনিয়ার পেছনে। বস্তুর ফাঁদে আমরা পড়ে আছি। তাই রামাযান কী তা জানবো কিভাবে? আল্লাহ যাদেরকে দান করেছেন হৃদয়প্রাচুর্য, যারা রামাযানের নূর ও বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ হতে সিদ্ধহস্ত, তারাই বোঝেন এ মহান মাসের সত্যিকারের মর্যাদা। আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) রজবের চাঁদ দেখার পর থেকেই পাঠ করতেন এ দু'আ–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ –

(مجمع الزوائد ١٢٥/٢)

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব ও শা'বানকে বরকতময় করুন। আমাদের হায়াতকে রামাযান পর্যন্ত বিকশিত করুন।'

একটু ভাবুন! স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) দুই মাস পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করতেন এ রামাযানের জন্য। সবিনয়ে প্রার্থনা করতেন আল্লাহরই কাছে এ মাসটি নিজের ভাগ্যে জোটানোর জন্য।

বয়স বৃদ্ধির প্রার্থনা

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টিমাফিক চলার উদ্দেশ্যে নিজের দীর্ঘায়ু কামনা করে দু'আ করা দূষণীয় নয়; বরং এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই উচিত হলো, এ দু'আ করা–হে আল্লাহ! আমার বয়স বাড়িয়ে দাও এমনভাবে, যেন আমল করতে পারি আপনি যেভাবে চান সেভাবে এবং যখন উপস্থিত হবো আপনার কাছে, তখন যেন লাভ করতে পারি আপনার সন্তুষ্টি। কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে, যারা চায় এর উল্টোটা। তারা বলে, হে আল্লাহ! আপনি আপনাকে এ দুনিয়া থেকে নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ জাতীয় কামনা ও প্রার্থনা থেকে বারণ করেছেন। কারণ, দুনিয়ার দুরাবস্থা দেখে তুমি হয়ত মৃত্যু কামনা করছো, তোমার ধারণা মৃত্যুই তোমাকে মুক্তি দিয়ে দিবে, কিন্তু একটিবারের জন্যও কি ভেবে দেখেছো–আখেরাতের কি প্রস্তুতি নিয়েছো? এখন যদি তুমি মরে যাও, তাহলে তোমার আখেরাত যে ভালো হবে এর নিশ্চয়তা কী আছে তোমার কাছে? কাজেই দু'আ করবে মৃত্যুর নয়; বরং বাঁচার এবং যতদিন আল্লাহ হায়াত রেখেছেন, ততদিন তাঁর সন্তুষ্টমতে চলার।

জীবন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দু'আ

এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এভাবে–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ – (مسنداحمد ٣/٤٠)

'জীবন যদি আমার জন্য কল্যাণময় হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন। আর মৃত্যু যদি হয় আমার জন্য মঙ্গলময়, তাহলে আমাকে আপনি তুলে নিয়ে যান।'

সুতরাং কল্যাণকর জীবন কামনা করতে তো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মৃত্যু কামনা করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়।

রামাযানের অপেক্ষা কেন?

প্রশ্ন হলো, রামাযান পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন এতটা ব্যাকুল হতেন? কেন অপেক্ষমান থাকতেন এ মাসটির? এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা রামাযানুল মুবারককে নিজের মাস বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের দৃষ্টি ও বুঝ স্থূল। তাই আমরা ভাবি, রামাযানের বৈশিষ্ট্য হলো এটা রোযার মাস। এ মাসে রোযা রাখা হয়, তারাবীহ পড়া হয়। অথচ এ মাসের নিগূঢ় তাৎপর্য এতটুকুতেই শেষ নয়। মূলত রামাযানের মাসের যাবতীয় ইবাদত আরেকটি জিনিসের প্রতীক। আর তাহলো, আল্লাহ তা'আলা এ মাসটিকে নিজের মাস বলেছেন। এর অর্থ হলো, যারা বাকি এগার মাস বিত্ত-বৈভবে ডুবে ছিলো, দুনিয়ার নেশায় পড়ে ছিলো, রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে ছিলো, ফলে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো এবং গাফলতির চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিলো, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই একটি মাস ঠিক করে দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারে। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলে থাকেন, উদ্দাম স্বাধীনতা ও অপরিমিত আনন্দের মাঝে এগারটি মাস কাটিয়েছো, নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলেছো, লোভ-লাভ ঘেরা পৃথিবীর টানে আমার থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছো, এবার ফিরে আস, আমার এ মাসটিতে আমারই নৈকট্য লাভ কর। কেননা, এটা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের মাস।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ মানবজাতিকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে কুরআন মজীদে তিনি বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ○ (سورة الذاريات ٥٦)

আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।

(সূরা যারিয়াত : ৫৬)

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত। ইবাদত করার জন্যই তারা এ পৃথিবীতে আসে।

ফেরেশতারা কি যথেষ্ট নয়?

কেউ যদি মনে করেন যে, ইবাদত করার জন্য তো আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই ফেরেশতা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে মানবসৃষ্টির প্রয়োজনই বা ছিলো কি?

এর উত্তর হলো, ফেরেশতাদেরকে যদিও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু তাদের ইবাদতটা হলো স্বভাবজাত। তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে এমনভাবে যে, তারা গুনাহ করার কিংবা আল্লাহর নাফরমানি করার ক্ষমতা রাখেনা। তাই তারা সৃষ্টিগতভাবেই ইবাদত করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে, সে গুনাহ করার ক্ষমতা রাখে এবং ইবাদত করার ক্ষমতাও রাখে। পাপের প্রবলতা এবং পাপবিরোধী শক্তি তার মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান। তারপর আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন ইবাদত করার। সে কারণে ফেরেশতাদের পক্ষে ইবাদত করা সহজ। এর বিপরীত চলার শক্তি তো তাদের মাঝে নেই। কিন্তু মানুষ তো সৃষ্টিগতভাবে এরকম নয়। বরং তাদের মাঝে প্রবৃত্তির তাড়না আছে, আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, লোভ-লাভ ও প্রয়োজন আছে। আছে গুনাহ করার পরিপূর্ণ শক্তিমত্তাও। এসব কিছুই তার মাঝে আছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে গুনাহর এসব আবেদনকে উপেক্ষা করে, আবেগ ও উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং গুনাহর কামনা-বাসনাকে দলিত করে আল্লাহর ইবাদত কর।

ইবাদত দুই প্রকার

এখানে আরেকটি বিষয় বুঝে নিতে হবে– যে বিষয়টি না বোঝার কারণে অনেক ক্ষেত্রে নানা প্রকার ভ্রান্তির উদ্ভব দেখা দেয়। বিষয়টি হলো–একদিকে মুমিন বান্দার প্রতিটি কাজই বিশুদ্ধ নিয়ত এবং বিশুদ্ধ তরিকায় সম্পাদিত হলে ইবাদত হিসাবে বিবেচিত হয়। একজন মুমিন বান্দা যদি সুন্নাত তরিকায় জীবন যাপন করে, তাহলে তার খানাপিনা, ওঠাবসা, মেলামেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-সংসারসহ সবকিছুই ইবাদতের আওতাভুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, একজন

মুমিন বান্দার সবকিছুই তো ইবাদত, অনুরূপভাবে নামাযও একটি ইবাদত, কিন্তু এ দুই ইবাদতের মাঝে পার্থক্য কী? এ দুইয়ের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যটা বুঝে নেয়া দরকার। এটা না বোঝার কারণেই অনেকেই ভ্রান্তির জালে আটকে যান।

এক. প্রত্যক্ষ ইবাদত

এ দুই ইবাদতের মাঝে পার্থক্য এই : কিছু আমল এমন আছে, যেগুলো সরাসরি ইবাদত। এগুলো দ্বারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীই উদ্দেশ্য হয়। এছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যের জন্য এগুলো দেয়া হয়নি। যেমন নামায। একজন মুমিন বান্দা শুধু আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর উদ্দেশ্যেই নামায পড়ে। নামাযের মধ্যে এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং নামায হলো একটি মৌলিক ও প্রত্যক্ষ ইবাদত। রোযা, যাকাত, যিক্‌র, তেলাওয়াত, হজ্ব-উমরা এগুলোও প্রত্যক্ষ ইবাদত। কারণ, এগুলোর একটাই উদ্দেশ্য– আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী।

দুই. পরোক্ষ ইবাদত

এর বিপরীতে এমন কিছু আমল রয়েছে, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর বন্দেগী নয়– বরং পার্থিব প্রয়োজন ও আবেদন পূরণ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর দয়া করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, এ পার্থিব কাজগুলোও যদি তোমরা নেক নিয়তে আমার বিধানের আলোকে কর এবং আমার রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদন করতে পার, তাহলে এর বিনিময়ে আমি ঠিক অনুরূপ সাওয়াব দেবো, যেমনিভাবে প্রত্যক্ষ ইবাদতের বিনিময়ে সাওয়াব দিয়ে থাকি। এই ধারার ইবাদত হলো দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত। অর্থাৎ এগুলো সরাসরি ইবাদত নয়; বরং শর্তসাপেক্ষ ইবাদত। সুতরাং এগুলো পরোক্ষ ইবাদত।

হালাল উপার্জন একটি পরোক্ষ ইবাদত

যেমন– বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় করার উদ্দেশ্যে বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে এবং এই নিয়ত করে যে, আমি হালাল উপার্জন করছি যেন আমার উপর শরীয়তকর্তৃক আরোপিত আমার স্ত্রী-সন্তানের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারি। তাহলে তার এ উপার্জনটাও ইবাদত হিসাবে বিবেচিত হ

প্রথম প্রকার ইবাদতই শ্রেষ্ঠ

উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেলো, এই দুই প্রকারের ইবাদতের মধ্য থেকে প্রথম প্রকারের ইবাদত দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর বাণী– আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি– এর দ্বারা প্রথম প্রকারের ইবাদতকেই বোঝানো হয়েছে।

একজন চিকিৎসকের ঘটনা

কিছুদিন পূর্বে এক মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমার স্বামী একজন চিকিৎসক। তার একটা ক্লিনিক আছে। রোগীদের চিকিৎসা করে। নামাযের সময় হলে সে নামায পড়ে না। রাতে যখন বাসায় ফিরে, তখন একসঙ্গে তিন ওয়াক্ত নামায আদায় করে। আমি তাকে বলেছি, বাসায় এসে তিন ওয়াক্ত নামায একসাথে পড়েন কেন? নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে ক্লিনিকে পড়ে নিলেই তো হয়। এতে নামায কাযা হয়না। আমার স্বামী আমাকে বলল, ক্লিনিকে আমি রোগী দেখি। এটা সৃষ্টির সেবা। সৃষ্টির সেবা এক মহান ইবাদত। এর সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। তাই আমি একে প্রাধান্য দিই। আর নামায তো আমার ব্যক্তিগত বিষয়। তাই বাসায় এসে একসাথে পড়ে নিই। মহিলাটি আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমি আমার স্বামীর এই যুক্তির কী উত্তর দেবো?

নামাযের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই

মহিলার স্বামীর এ দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। সে ইবাদতের উভয় প্রকারের পার্থক্য বুঝতে পারেনি। নামায তো একটি সরাসরি ইবাদত। যে নামায সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে হও, শত্রুবাহিনীর মুখোমুখী থাক, তবুও তোমরা নামায ছাড়বে না। যদিও সে অবস্থাতে পদ্ধতিগতভাবে কিছুটা শিথিল কথা হয়েছে। কিন্তু নামায ছাড়ার কোনো অবকাশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ হলো–

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ○ (سورة النساء ١٠٣)

নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

–(সূরা নিসা : ১০৩)

দেখুন, জিহাদের মত মহান আমলের মধ্যেও নামায সময় মত পড়তে বলা হয়েছে। নামাযের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হয়নি।

সৃষ্টির সেবা দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত

এমনকি যদি কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, যার ফলে কোনো কাজ-কর্ম করতে পারে না। তাকেও বলা হয়েছে, নামায অবশ্যই পড়তে হবে। এ অবস্থায়ও নামায মাফ দেয়া হয়নি। তবে হ্যাঁ এতটুকু সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে পড়বে। বসে পড়তে না পারলে শুয়ে পড়বে। প্রয়োজনে ইশারা-ইঙ্গিতে পড়বে। অযু করতে না পারলে তায়াম্মুম করবে। তবুও নামায পড়তেই হবে। কেননা, এটা প্রত্যক্ষ ইবাদত। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এ ইবাদতের জন্যই। চিকিৎসক রোগী দেখেন। এটি সৃষ্টির সেবা। নিশ্চয় এটিও একটি ইবাদত। তবে এটি সরাসরি ইবাদত নয়; বরং পরোক্ষ ইবাদত। তাই কোনো ক্ষেত্রে যদি এ দু'ধরনের ইবাদত সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে প্রথম প্রকারের ইবাদতকেই।

অন্যান্য প্রয়োজনের তুলনায় নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ

দেখুন, আপনি যদি একজন চিকিৎসক হন। চিকিৎসা দেয়ার সময় আপনাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে উঠতে হয়– বাথরুমে যেতে হয়, অন্যান্য প্রয়োজনেও আপনাকে রোগী ছেড়ে উঠতে হয়। ক্ষুধা লাগলে তখন পানাহারের জন্য বিরতি দিতে হয়। সুতরাং যখন অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বিরতি দিতে পারছেন, তাহলে নামাযের জন্য বিরতি দিতে সমস্যাটা কী? এতে সৃষ্টির সেবায় এমন কী ক্ষতি হবে? অথচ নামায অপরাপর মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্ব। মূলত চিন্তার এ দৈন্যতা সৃষ্টি হয়েছে ইবাদতের তাৎপর্য ও তার প্রকারদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য না বোঝার কারণে।

মানবজাতির পরীক্ষা

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদতের জন্য, যেন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। তা এভাবে যে, তিনি মানুষের মধ্যে নানা ধরনের কামনা-বাসনা রেখে দিয়েছেন। রেখে দিয়েছেন অন্যায়-অপরাধের প্রতি আকর্ষণ। এর মাধ্যমে তিনি দেখতে চান, এসব কামনা-বাসনা ও আকর্ষণ উপেক্ষা করে বান্দা কতটা আল্লাহর কথা স্মরণ করে। কতটা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়। সে তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে কতটা মনে রাখে। এটাই হলো পরীক্ষা।

এ নির্দেশ অন্যায় হতো না মোটেও

আল্লাহ তা'আলা যদি এ নির্দেশ দিতেন, তোমরা যেহেতু ইবাদতের জন্যই সৃষ্ট, সুতরাং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল আমার সিজদাতেই পড়ে থাকবে। আমার যিক্‌র ও ফিক্‌রই তোমাদের একমাত্র কাজ। তবে যেহেতু তোমাদের কিছু ইচ্ছা ও প্রয়োজন আছে, তাই এতটুকু অবকাশ দিচ্ছি, ইবাদতের মাঝখানে মাঝখানে এতটুকুন সময়ের বিরতি নিতে পার, যেই সময়টুকুতে দুপুরের ও সন্ধ্যার খাবার গ্রহণ করতে পারবে। যাতে তোমরা বেঁচে থাকতে পার। এছাড়া পুরা সময়টা আমার ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন নির্দেশ দিতেন, তাহলে সেটা মোটেও অন্যায় হতো না। কেননা, তিনি তো আমাদেরকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আমরা বিক্রিত পণ্য

একদিকে তিনি বলেছেন, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য এবং এটাই তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য, অপরদিকে তিনিই ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ○

(سورة التوبة ١١١)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। –(সূরা তাওবাহ : ১১১)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আমরা বিক্রিত পণ্য। আমাদের জীবন ও সম্পদ স্বয়ং আমাদের প্রভু– যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন– খরিদ করে নিয়েছেন। খরিদ করেছেন এক মহান মূল্যের বিনিময়ে। তা হলো জান্নাত, যার প্রশস্ততা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত। সুতরাং ক্রেতা প্রভু যদি আমাদেরকে বলে দেন, শুধু জীবন বাঁচানোর পরিমাণ পানাহারের সময়টুকু তোমরা পাবে। এছাড়া অবশিষ্ট পুরো সময় আমার সামনে সিজদায় পড়ে থাকবে, তাহলে এ অধিকার অবশ্যই তার আছে। এটা বললে আমাদের প্রতি তাঁর কোনো অবিচার হবেনা। কিন্তু এ মহান ক্রেতা যিনি সুমহান মূল্যে আমাদের জীবন ও সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে আবার জীবন ও সম্পদ ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। এবং এ জীবন ও সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ারও সুযোগ দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, তোমরা পানাহার কর, ব্যবসা-বাণিজ্য কর, চাকরি-বাকরি কর, বৈধ উপায়ে জীবনের কামনা-বাসনা পূর্ণ কর–এতে কোনো বাধা নেই। তবে শুধু এতটুকু করবে যে, আমার দরবারে প্রতিদিন পাঁচবার করে হাজির হবে।

নিয়মমতো এ পাঁচবার হাজিরা দেয়ার পর অবশিষ্ট সময় তোমরা স্বাধীন। তোমাদেরকে অবশিষ্ট সময় ছুটি দেয়া হয়েছে।

জীবনের লক্ষ্য ভুলে বসেছে

কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা ও ছুটি পাওয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, জমি-জিরাত ও খানাপিনায় এতটা ডুবে গেছে যে, জীবনের মূল লক্ষ্যই ভুলে বসেছে। ভুলে গেছে যে, তারা তো বিক্রিত। ভুলে গেছে আল্লাহর ওইসব বিধি-নিষেধের কথা, যা তাদের উপর আরোপিত আছে। এখন সে ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জনের পেছনেই শুধু ছুটে বেড়াচ্ছে। রাত-দিন তার শুধু একটাই চিন্তা– কিভাবে বাড়াবো উপার্জনের কলাকৌশল। যদি কেউ নামযের কথা ভাবেও, তাহলে উদাসীনতা নিয়ে চলে যায় মসজিদে এবং তড়িঘড়ি করে কোনোরকম নামাযটা শেষ করে। তারপর পুনরায় লেগে যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে। আবার অনেক সময় তো মসজিদেই যায় না। নামায ঘরেই পড়ে নেয়। মাঝেমধ্যে ছেড়েও দেয়। এভাবে ধীরে-ধীরে মানুষ অর্থ কামানোর উদ্দামতার ভেতর নিজেকে বিলীন করে দেয়।

ইবাদত ও পার্থিব কাজকর্মের বৈশিষ্ট্য

ইবাদতের বৈশিষ্ট্য হলো, ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুপম প্রাচুর্য দ্বারা লাভবান হয়।

পক্ষান্তরে পার্থিব কাজ-কর্মের বৈশিষ্ট্য হলো, তা মানুষকে ধীরে-ধীরে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ ধীরে-ধীরে রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এমনকি বিশুদ্ধ তরিকায় সম্পাদিত পার্থিব কাজ-কর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য।

একজন মানুষ যখন এগার মাস এই পার্থিব কাজ-কর্মে লেগে থাকে, তখন বস্তুবাদী স্বভাব তার মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে। সে তখন অর্থ উপার্জনের ধান্ধায় এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ার কথা ছিলো, তা শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে পড়ে। দুর্বল হয়ে পড়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা-তৎপরতা। আর এটাই তার জন্য স্বাভাবিক। কারণ, পার্থিব কাজ-কর্মের প্রকৃতিই এটা।

রহমতের বিশেষ মাস

আর আল্লাহ যেহেতু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি জানেন তাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। তিনি ভালো করেই জানেন মানুষ যখন দুনিয়ার ধান্ধায় পড়ে

যাবে, তখন আমাকে ভুলে যাবে। ফলে পার্থিব কাজ-কর্মের রূপ-রস-গন্ধে সে এতটাই মোহাবিষ্ট থাকবে যে, আমার ইবাদতের কথা সে ভুলে যাবে। এজন্যই তিনি বলেছেন, হে মানুষ, আমি তোমাকে একটি সুযোগ দিচ্ছি, প্রতি বছরই এ সুযোগটা পাবে। আমি প্রতি বছরই তোমাদের একটি বিশেষ মাস দান করবো, যাতে করে পার্থিব কাজ-কর্মের আকর্ষণের মাঝে পড়ে থেকে যে এগারটি মাস আমার ইবাদত ও রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে– সেই ক্ষতি যেন এ মাসে পুষিয়ে নিতে পার। এ মাসটিতে তোমরা আমার কাছে চলে আসবে, যাতে তোমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষয়-ক্ষতিগুলো কেটে যায়। আমার সাথে সম্পর্কের যে দৈন্যতা এতদিনে সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন শেষ হয়ে যায় এবং সতেজ ও সজীব সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মূলত এ মহান লক্ষ্যেই আমি হিদায়াতের এ মাস তোমাদেরকে দান করেছি। পার্থিব কাজ-কর্মের প্রতি বিরামহীন ঘনিষ্ঠতার কারণে তোমাদের হৃদয়ে যে জং ধরেছে, তা তোমরা এ মাসে পরিষ্কার করতে সচেষ্ট হবে। এতদিনে আমার থেকে তোমরা যতটা দূরে সরে গিয়েছিলে, এই মাসে ততটা তোমরা আমার কাছে চলে আসবে।

তোমাদের হৃদয়ে যে গাফলতি ও অলসতার বাসা বেঁধেছে, সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে অন্তরকে আমার যিক্র দ্বারা আবাদ করতে সচেষ্ট হবে। মূলত এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রামাযান মাস দান করেছেন। রামাযানের রোযার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হবো– মূলত রামাযানের অন্যতম লক্ষ্য এটাই। রোযা ছাড়া এ মাসে আরো যেসব ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, সবগুলোর উদ্দেশ্যই মূলত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। মহান আল্লাহ্ মূলত তাঁর দূরে চলে যাওয়া বান্দাকে এ মাসে নিজের কাছে আনতে চান।

এবার নৈকট্যলাভে ধন্য হও

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ (سورة البقرة ١٨٣)

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অর্জন করতে পার। –(সূরা আল-বাকারা : ১৮৩)

গত এগারটি মাস তোমাদের কাজ-কর্ম ছিলো লাগামহীন, যেসবের পেছনে পড়ে তোমরা নিজেদের তাক্‌ওয়া ও আল্লাহভীতির বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল করে

ফেলেছ। এবার ফিরে আস। এ মাসে তোমরা তাক্ওয়ার এ বৈশিষ্ট্যকে জীবন্ত ও শক্তিমান করতে সচেষ্ট হও। কাজেই শুধু রোযা রাখলে আর তারাবীহ পড়লেই এ মাসের করণীয় শেষ হয়ে যায় না। বরং এ মাসকে বরণ করে নিতে হবে এ লক্ষ্যে যে, বিগত এগার মাসের যে কর্মব্যস্ততা একজন মানুষকে তার মূল টার্গেট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো, সেই দূরত্বকে মিটিয়ে দেয়া এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। আর এর উপায় হলো, শুরু থেকে রামাযান মাসকে একটি ইবাদত মাস হিসাবে বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে করতে হবে, গত এগারটি মাস বিভিন্ন পার্থিব কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি, তাই এ মাসটিকে শুধু ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটাবো। পার্থিব কাজকর্ম যতদূর সম্ভব কাটছাট করে নিবো। এ মাসে যেসব দুনিয়াবী কাজ পিছিয়ে দেয়া সম্ভব, সেগুলোকে পিছিয়ে দেবো। এভাবে যতটুকু সময় বের করা যায়, পুরো সময়টা শুধু ইবাদতের মধ্যে কাটাবো।

দ্বীনি মাদরাসাসমূহের বার্ষিক ছুটি

দীর্ঘদিন থেকে আমাদের মাদরাসারগুলোতে পনেরই শা'বান থেকে পরবর্তী পনেরই শাওয়াল পর্যন্ত বার্ষিক ছুটির একটা রেওয়াজ চলে আসছে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন এটা করেছেন যেন পুরো রামাযান মাসটা ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটানো যায়। এমনিতে মাদরাসাগুলোতে মাস-বছরে যেসব কর্মসূচী পালিত হয়, তার সবক'টিই ইবাদত। যেমন– কুরআন মজীদের শিক্ষা, হাদীস-ফিকাহ ইত্যাদির শিক্ষা সবই ইবাদত। তবে যেহেতু এগুলো রামাযানের রোজার মত সরাসরি ইবাদত নয়, তাই আমাদের বুযুর্গানে-দ্বীন রামাযান মাসকে বার্ষিক ছুটি হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন, যেন পুরো মাসটাই সরাসরি ইবাদতের মধ্যে কাটানো যায়।

তারাবীহ মামুলি বিষয় নয়

একজন মুমিন বান্দার কর্তব্য হলো, রামাযান আসার পূর্বেই একটি রুটিন তৈরি করে নেয়া। যেসব কাজ নগদ নয়, বরং পরবর্তীতে করার সুযোগ আছে, সেগুলোকে পিছিয়ে দিয়ে পুরো মাসটা কিভাবে ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটানো যায়– এ লক্ষ্যে তারাবীহ, তিলাওয়াত, যিক্রসহ বিভিন্ন আমলের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রুটিন করে নেয়া উচিত। রামাযানের তারাবীহ সম্পর্কে হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, রামাযানের তারাবীহ একজন মুমিনের জন্য একটি বিরল বিষয়। এ তারাবীহর উসিলাতেই সে প্রতিদিন অন্যান্য দিনের চাইতে আল্লাহর নিকটে পৌঁছার অধিক সুযোগ পায়। কেননা, বিশ রাকাতের মধ্যে আল্লাহকে সিজদা করতে হয় চল্লিশবার।

আর প্রতিটি সিজদাই হলো মহান আল্লাহ নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ স্তর। কারণ, সিজদায় বান্দা নিজের দেহের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ স্থান কপালটিকে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর ভক্তিসহকারে উচ্চারণ করে– সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছার এ সৌভাগ্য এ পৃথিবীর বুকে ক'জনের নসিব হয়? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) মি'রাজের রাতে এ সৌভাগ্যই লাভ করেছিলেন। এ মর্যাদা লাভ করার সময় তিনি ভেবেছিলেন, এ উপহার আমি আমার উম্মতের জন্যও নিয়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও অনুমতি পেয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আপনার উম্মতের জন্য সিজদার এ উপহার নিয়ে যান। মু'মিনের প্রতিটি সিজদাই মি'রাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ– যখন মুমিন বান্দা নিজের সবচে সম্মানিত অঙ্গ কপালকে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে আল্লাহকে সিজদা করে, তখন সে মূলত মি'রাজের মর্যাদায়ই ধন্য হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সূরা ইক্বরাতে বলেছেন–

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

সিজদা কর এবং আমার নিকটবর্তী হও।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকটে চলে যায়। রামাযানে প্রতিদিনই আমাদেরকে চল্লিশটি সিজদা অতিরিক্ত দান করা হয়েছে। বিগত এগার মাসে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, এটা মূলত সেই দূরত্বকে শেষ করে দেয়ারই একটি বাস্তব উপায়। সুতরাং এই তারাবীহ কোনো সাধারণ বিষয় নয়। কেউ-কেউ বলে, আমরা আট রাকাত তারাবীহ পড়বো, বিশ রাকাত পড়বো না। এর অর্থ এই দাঁড়ায়– আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্য দান করার জন্য আমাদেরকে চল্লিশটি সিজদা দিয়েছিলেন। কিন্তু এরা যেন বলছে, না, আমরা শুধু ষোলটি নেবো, চল্লিশটির দরকার নেই। আসলে এরা সিজদার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তথা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। এজন্য এমনটি বলে থাকে।

কুরআন তেলাওয়াত

খোলাসা কথা হলো, রামাযানের রোযা তো অবশ্যই রাখতে হবে। তারাবীহও পড়তেই হবে। এ ছাড়াও যতটুকু সম্ভব ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। বিশেষ করে কুরআন মজীদ তেলাওয়াতে অধিক সময় দিতে হবে। কেননা, রামাযানের সঙ্গে কুরআন মজীদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই

রামাযানের অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করতে হবে। ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহ.) রামাযানে প্রতিদিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। রাতে শেষ দিতেন আরেক খতম। এভাবে পুরা রামাযানে একষট্টি খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আল্লামা শামী রামাযানের দিন ও রাত মিলিয়ে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। বড়-বড় বুযুর্গানে দ্বীন তাদের প্রতিদিনের কর্মসূচিতে কুরআন তেলাওয়াতকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কাজেই আমাদের উচিত অন্যান্য দিনের চেয়ে রামাযানে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা।

রামাযান ও নফল নামায

রামাযানের বাইরে যেসব নফল নামায পড়ার সুযোগ হতো না, রামাযানে সেসব নামাযের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। যেমন– বছরের অন্যান্য দিনগুলোতে সাধারণত তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ খুব একটা হয়ে ওঠে না। কিন্তু রামাযান মাসে যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্য উঠতেই হয়, তাই একটু আগে উঠে কয়েক রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে নেয়া চাই। তাছাড়া চাশত, আওয়াবিন ইত্যাদির প্রতিও যত্নবান হওয়া চাই।

রামাযান ও দান-সদকা

রামাযানে অন্যান্য মাসের চাইতে দান-সদকা অধিক পরিমাণে করা উচিত। শুধু যাকাতই নয়, এ ছাড়াও নফল দান-খয়রাতের প্রতিও যত্নবান হওয়া উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দানের সমুদ্র তো সারা বছরই উত্তাল থাকতো। কিন্তু রামাযান এলে তা আরো উত্তালময় হয়ে উঠতো। তাঁর কাছে যা-ই আসতো, তিনি তা বিলিয়ে দিতেন। এজন্য আমাদেরও উচিত রামাযানে অধিকহারে দান-সদকা করা।

রামাযান ও যিক্‌র

এ ছাড়াও রামাযানে সর্বাবস্থায় যিক্‌র-আযকারে মগ্ন থাকার চেষ্ট করতে হবে। হাতে কাজ চলবে আর মুখে চলবে আল্লাহর যিক্‌র।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ –

এটা খুবই উত্তম একটি যিক্‌র। এছাড়াও দরূদ শরীফ, ইসতেগ্‌ফার ও অন্যান্য যিক্‌র-আযকারে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকতে হবে।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

রামযান মাসে বিশেষ করে গুনাহ থেকে বাঁচার সার্বক্ষণিক চেষ্টায় থাকতে হবে। রামযান আসার পূর্বে মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, গুনাহ তো দূরের কথা, অপাত্রে চোখও উঠাবো না। কুদৃষ্টি দেবো না। মিথ্যা বলবো না। গীবত করবো না। এটা অযৌক্তিক যে, রামাযান এলে আমরা হালাল খেতে সচেষ্ট হলেও মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে কুণ্ঠিত হই না। কারণ, কুরআন মজীদের ভাষ্যমতে গীবত মানেই মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। সুতরাং অনর্থক আড্ডা-গল্প, মিথ্যা ও গীবত ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কান্নাকাটি করা

মনে রাখতে হবে, এ মাসে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের অবারিত ধারা প্রতিটি মুহূর্তে বর্ষিত হতে থাকে। তাঁর রহমত ও মাগফিরাতের দরজা সর্বক্ষণ খোলা। তাই তাঁর দরবারে খুব কান্নাকাটি করতে হবে। এ মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়, 'হে বান্দা! আমার কাছে চাও, তোমার প্রার্থনা কবুল করবো। রোযা অবস্থায় চাও, ইফতারের সময় চাও, সাহরীর সময় চাও, আমি দেয়ার জন্য প্রস্তুত। এই জন্য সকলেরই উচিত এ মাসে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে চাওয়া। তাঁর কাছে দু'আ করা। নিজের জন্য, বন্ধু-বান্ধবের জন্য, সমাজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য বেশি করে দু'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে রামাযানের কদর করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা :

প্রয়োজন মধ্যপন্থা অবলম্বন

"... আমরা নিজের দলের লোককে এমনভাবে উঠাতে থাকি যে, তার মাঝে কোনো দোষ–অন্যায় দেখি না। মনে করি, সে তো ফুলের মত পবিত্র। তারপর কোনো কারণে যদি তার সাথে মনোমালিন্য হয়, তখন তার বাপ–দাদা চৌদ্দগোষ্ঠীর পোশাক খসিয়ে ছাড়ি। এ হলো আমাদের অবস্থা। অথচ উভয়টাই বাড়াবাড়ি।"

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা : প্রয়োজন মধ্যপন্থা অবলম্বন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا –

(ترمذی ، کتاب البر والصلة ، باب ماجاء فی الاقتصاد فی الحب والبغض حدیث نمبر ۱۹۹۸)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)। সনদ বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ। চমৎকার হাদীস। এতে রয়েছে বিস্ময়কর কিছু শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা। রয়েছে আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য কিছু সোনালী মূলনীতি। হাদীসটির অর্থ এই–

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করো ধীরে-ধীরে। অর্থাৎ– বন্ধুত্বের বেলায় বাড়াবাড়ি নয়। সংকীর্ণ মানসিকতায় নয়, বরং অবলম্বন করো মধ্যপন্থা। কেননা, একদিন তোমার এই বন্ধু তোমার শত্রু হয়ে যেতে পারে। তোমার বিদ্বেষে কঠোর হয়ে উঠতে পারে সে। অনুরূপভাবে যার সাথে তোমার শত্রুতা রয়েছে, সেই শত্রুকেও শত্রু ভাবো ধীরে-ধীরে। কেননা, এমনও তো হতে পারে, এই শত্রু একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

হাদীসটির শিক্ষা এই– বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এবং কঠোরতা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে উচিত হলো মধ্যরেখায় অবস্থান করা। মনে রাখবেন, এ পার্থিব জগতের কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতাও এ জগতে ক্ষণস্থায়ী। এখানে বন্ধুও একদিন শত্রু হয়ে যেতে পারে। কিংবা শত্রুও হতে পারে পরম বন্ধু।

আমাদের বন্ধুত্বের অবস্থা

এ হাদীসে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে, যারা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। কারো সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর লাগামহীন হয়ে পড়ে। বন্ধুত্বের উপচানো আনন্দে একেবারে বুঁদ হয়ে যায়। এতটাই আমোদিত হয় যে, বন্ধুর মাঝে সে কোনো দোষ খুঁজে পায় না। রাত-দিনের রুটিন হয়ে যায় তার বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা সবকিছুতেই সে বন্ধুকে খুঁজে বেড়ায়। বিরামহীনভাবে সে তখন বন্ধুর প্রশংসা করে ফিরে। কিন্তু কিছুদির পর শোনা যায় অন্য খবর। বেজে উঠে ভাঙ্গনের সুর। পরম বন্ধু হয়ে যায় চরম শত্রু। একজন অপরজনের নাম শুনলেও এখন আঁতকে ওঠে। এতদিন প্রশংসা যার শেষ হয় না, এবার যেন কুৎসাও তার ফুরায় না। একেই বলে বাড়াবাড়ি। এটা ইসলাম পরিপন্থী চরিত্র। রাসূল (সা.) এটাকেই নিষেধ করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাতে বাড়াবাড়ি নয়; বরং অবস্থান কর মাঝামাঝিতে। যদি শত্রুতা পোষণ কর, তাও যেন হয় পরিমিত। বাড়াবাড়ি কোনো ক্ষেত্রেই কাম্য নয়।

বন্ধুত্বের একমাত্র উপযুক্ত

মনে রাখবেন, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার প্রকৃত রূপ-রস দুনিয়ার মাখলুকের মাঝে নেই। বন্ধুত্বের প্রকৃত হকদার শুধু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। শুধু তাঁরই ভালোবাসা হৃদয়ে স্থান দেয়ার মতো। হৃদয়পাতালে লুকিয়ে থাকবে একমাত্র তাঁর মহব্বত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাদের শরীরে একটি হৃদয় দিয়েছেন, যে হৃদয় তিনি নিজের জন্যই বানিয়েছেন। হৃদয় মানেই আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে আলোকিত হওয়ার পবিত্র ঠিকানা। আমাদের ক্বলব, আমাদের দিল, আমাদের রূহ, আমাদের হৃদয়, কিন্তু মালিক তো আমরা নই। মালিক হলেন আল্লাহ। সুতরাং এ হৃদয়ে অপর কাউকে এমনভাবে স্থান দেয়া উচিত নয় যে, আমাদেরকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কোনো মুমিনের জন্যই এটা সমীচিন নয়। মুমিন-হৃদয়ে থাকা চাই একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা।

একমাত্র সাচ্চা দোস্ত সিদ্দীকে আকবর (রা.)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত কাছের মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার যে নজির তিনি পেশ করেছেন, দুনিয়ার অন্য কেউ এমনটি আর পারবে না। এভাবে একজন মানুষ একজন মানুষকে ভালোবাসতে পারে! পদে-পদে তিনি এ ভালোবাসার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে। যেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেছেন- آمَنَّا وَصَدَّقْنَا -আপনাকে বিশ্বাস করেছি, আপনার উপর ঈমান এনেছি। সেদিন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর এ বন্ধুত্বের সামান্যতম চিড় কেউ ধরাতে পারেনি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি এ পৃথিবীর কাউকে হৃদয়ের সম্পূর্ণ ভালোবাসা দিতেন, তাহলে এর জন্য আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর চেয়ে অধিক হকদার আর কে হতে পারে?

গারে-ছাওরের ঘটনা

গারে-ছাওরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন। কুরআনের ভাষায়-

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ○

(سورة التوبة ٤٠)

যখন তাঁরা দুজন ছিলেন গারে তথা ছাওর গুহায়, তখন তিনি আপন সাথীকে বলছিলেন, ভয় পেও না; আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) গুহা পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে প্রবেশ করছিলেন। সাপ-বিচ্ছুসহ বিষাক্ত প্রাণীগুলোর গর্ত বন্ধ করে দেয়ার জন্য তিনি প্রবেশ করলেন। নিজের পরিধেয় পোশাক টুকরা টুকরা করে গর্তগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাপড় যখন ফুরিয়ে গেলো, তখনও একটি গর্ত অবশিষ্ট ছিলো। সেটিকে তিনি নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা চেপে ধরে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

হিজরতের একটি ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন হিজরতের সফরে। তখন আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) পবিত্র চেহারায় ক্ষুধার ছাপ দেখতে পেলেন। তাই তিনি দুধ জোগাড় করে এনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে পেশ করলেন। অথচ তিনি নিজেও ক্ষুধার্ত ছিলেন। বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)

সেই দুধ পান করলেন। পরবর্তী সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনভাবে দুধ পান করলেন যে, আমি তৃপ্ত হয়ে গেলাম। অর্থাৎ দুধ পান করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.); অথচ তৃপ্ত হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এজন্যই বলি, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও কুরবানীর যে নযরানা হযরত আবু বকর (রা.) পেশ করেছেন, এ পৃথিবীর অন্য কেউ তা কখনও পারবে না।

বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর সাথে

এতদসত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (রা.) বলতেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً -

(صحيح البخارى ، كتاب الفضائل)

অর্থাৎ– 'এ পার্থিব জগতে যদি আমি কাউকে সত্যিকারের বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবু বকরকে বানাতাম। এর অর্থ হলো– আবু বকরকেও আমি বন্ধু বানাইনি। কেননা, সত্যিকার অর্থে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায়, তা শুধু আল্লাহর সাথে হতে পারে। এমন বন্ধুত্ব, যে বন্ধুত্ব হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে পারে, নিজের ইচ্ছা-আবেগ সবকিছু যে বন্ধুত্বের সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই বন্ধুত্ব তো আল্লাহর সঙ্গেই হতে পারে। তিনি ছাড়া এমন বন্ধুত্ব আর কারো সাথেই সঙ্গত হতে পারে না।

বন্ধুত্ব হওয়া চাই আল্লাহর বন্ধুত্বের অনুগামী

হ্যাঁ, দুনিয়াতেও বন্ধুত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে তা হতে হবে আল্লাহর বন্ধুত্বের অনুগামী। সুতরাং বন্ধুত্ব যেন গুনাহর বাহন না হয়। বন্ধুত্বের সীমানায় যেন গুনাহ প্রবেশ না করে। বন্ধু বললেই গুনাহ করা যাবে না, বরং প্রথম কথা হলো, দুনিয়ার সকল বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা হতে হবে আল্লাহর জন্য।

নিঃস্বার্থ বন্ধুর অভাব

দ্বিতীয় কথা হলো, দুনিয়াতে আজ এমন বন্ধুর বড়ই অভাব, যার বন্ধুত্বের ভিত্তি হবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। খোঁজ করে এমন দোস্ত মেলা ভার। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠিন পর্যায়ে পরিচয় পাওয়া যায় প্রকৃত বন্ধুর। ভাগ্যবানরাই পায় নিঃস্বার্থবান বন্ধু। আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর সামনে যখন আমার বড় ভাইয়েরা নিজেদের বন্ধুদের নাম নিতেন, তখন তিনি বলতেন, তোমাদের

তো দুনিয়াতে অনেক দোস্ত আছে। আমার বয়স এখন ষাট, আমি তো এত বন্ধু পেলাম না। গোটা জীবনে শুধু গোটা দেড়েক দোস্ত মিলেছে। একজন পূর্ণাঙ্গ দোস্ত, আরেকজন আধা দোস্ত। অথচ তোমাদের কত বন্ধু! আসলে বন্ধুত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় খুব কম মানুষই।

যাই হোক, আল্লাহর জন্য কাউকে বন্ধু বানালে সে ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এমন যেন না হয় বন্ধুর পেছনে রাত-দিন কেটে যায়। উঠা-বসা, খানা-পিনা সবকিছুই বন্ধুর সঙ্গেই হয়। মনের সব কথা বন্ধুকে জানানো– এটাও বোকামি। কেননা, যদি এ বন্ধুত্ব কোনোদিন শেষ হয়ে যায়, তাহলে এ বন্ধুই তোমাকে ডুবিয়ে মারবে। তোমার সব গোপন কথা অন্যের কাছে বলে বেড়াবে। তাই বন্ধুত্বের ক্ষেত্রের বাড়াবাড়ি অনুচিত।

শত্রুতার ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা

অনুরূপভাবে কারো সাথে যদি দুশমনি থাকে, সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়, তাহলেও এমন যেন না হয় যে তার পেছনে লেগে থাকবে, সব সময় তার দোষ খুঁজে বেড়াবে। মনে রাখতে হবে, খারাপ মানুষের মাঝেও আল্লাহ ভালো গুণ রাখতে পারেন। সুতরাং শত্রুতার কারণে তার ভালো গুণগুলো এড়িয়ে যাওয়া অন্যায় হবে। ভালো গুণগুলো দেখেও না দেখার ভান করা মোটেও উচিত হবে না। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا ○ (سورة المائدة ٨)

'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত কখনই ন্যায় বিসর্জন দিয়ো না।'

–(সূরা মায়িদা : ৮)

অর্থাৎ– ন্যায়-ইনসাফের নিক্তি সমান ও সঠিক হওয়া চাই। চরম শত্রুতা কিংবা পরম ভালোবাসার ক্ষেত্রে তার, কোনো পাল্লা যাতে ঝুঁকে না পড়ে। তোমার শত্রু বলে তার মাঝে ভালো কিছু নেই এমনটি কখনও ভাববে না। বরং সে যদি কোনো ভালো কাজ করে, তাহলে তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেবে। কিন্তু সমস্যা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্ত শিক্ষা আমরা সামনে রাখি না। তাই বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বাড়াবাড়ি করি। নয়তো শিথিলতা দেখাই।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের গীবত

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নামটা সকলেই জানেন। অসংখ্য জুলুমের নায়ক ছিলেন। আলেম-হাফেজদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয়েছিলো। এমনকি পবিত্র

কা'বা তার আক্রমণের শিকার হয়েছিলো। এতসব মন্দের সঞ্চালক হাজ্জাজের নাম শুনলে এবং তার ইতিহাস পড়লে তার প্রতি এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হয়। অথচ একবারের ঘটনা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর সামনে এক ব্যক্তি হাজ্জাজের কুকীর্তির বিবরণ দিচ্ছিলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সাথে-সাথে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আল্লাহর বান্দা, এটা ভেবো না যে, হাজ্জাজ জালিম; তাই তার গীবত তোমার জন্য বৈধ হয়ে গেছে। কিংবা তার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া তোমার জন্য হালাল হয়ে গেছে। মনে রাখবে, যখন আল্লাহ হাজ্জাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিচার করবেন, তখন তিনি তোমার এ গীবতেরও বিচার করবেন। জবাবদিহি দু'জনকেই করতে হবে। সুতরাং শত্রুতা ও বিদ্বেষের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক হালচাল

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক হালচালের কথা না বললেই নয়। আমরা যে দলটিকে ভালোবাসি, যার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ি, তাকে এমনভাবে উঠাতে থাকি যে, তার মাঝে আর কোনো দোষ-অন্যায় দেখি না। মনে করি, তিনি তো ফুলের মতো পবিত্র। কেউ যদি তার কোনো দোষের কথা বলে, তখন ক্ষোভে একেবারে ফেটে পড়ি। পক্ষান্তরে কোনো কারণে যদি তার সাথে মনোমালিন্য হয় কিংবা রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়, তখন তার বাপ-দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠির পোশাক খসিয়ে ছাড়ি। এ হলো আমাদের অবস্থা। অথচ উভয়টাই বাড়াবাড়ি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এটাকেই আলোচ্য হাদীসে নিষেধ করেছেন। আমি আপনাদেরকে বারবার বলে এসেছি, দ্বীন শুধু নামায– রোযার নাম নয়। হ্যাঁ, এগুলো দ্বীনের শীর্ষ অংশ। ভালোবাসা ও শত্রুতার পাল্লা একদিকে ঝুঁকে না পড়ার বিষয়টিও দ্বীনেরই একটি অংশ। আল্লাহর প্রকৃত বান্দাগণই দ্বীনের এসব বিষয় বোঝেন। তাই তারা শাসক ও রাজনৈতিক নেতাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। বাড়াবাড়ি করেন না আবার শৈথিল্যভাবও দেখান না। বরং তারা অবলম্বন করেন মধ্যপন্থা।

কাযী বুক্কার ইবনে কুতাইবা (রহ.)-এর চমৎকার একটি ঘটনা

কাযী বুক্কার ইবনে কুতাইবা (রহ.)। তিনি একাধারে বিচারপতি ও বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে তাহাবী শরীফ নামে হাদীসের একটি উচ্চাঙ্গের কিতাব পড়ানো হয়। এর সংকলক ইমাম তাহাবী (রহ.)। কাযী বুক্কার ছিলেন তাঁর ওস্তাদ। সমকালীন বাদশাহ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন।

এমনকি বাদশাহ প্রত্যেক কাজে তাঁর পরামর্শ ও মীমাংসা কামনা করতেন। যখন-তখন তাঁকে দরবারে ডেকে নিতেন। মিটিং-বৈঠকে তাঁকে দাওয়াত দিতেন। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ তাঁকে গোটা দেশের বিচারপতি বানিয়ে দিলেন। এ সুবাদে দেশের সব বিচারকার্য তিনি সমাধান দিতেন। বাদশাহর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল। বাদশাহ তাঁর যে কোনো সুপারিশ শুনতেন এবং মেনে নিতেন। এভাবেই চলতে লাগলো দিনের পর দিন।

কাযী বুক্কার কাযী ছিলেন, আলেম ছিলেন, কিন্তু বাদশাহর গোলাম ছিলেন না। একবার বাদশাহ একটি অন্যায় কাজ করে বসলেন। কাযী বুক্কার ফতওয়া দিলেন, বাদশাহর কাজটি অন্যায় হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে কাজটি সঠিক হয়নি। এ ফতওয়া শোনামাত্র বাদশাহ খুব অসন্তুষ্ট হলেন। ভাবলেন, আমি এতদিন পুষে আসছি। হাদিয়া-তোহফা দিয়ে আসছি। তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে আসছি। অথচ তার ফতওয়া এখন আমার বিরুদ্ধে! এই ভেবে সাথে-সাথে তাঁকে কাযী পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন।

আসলে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মন-মানস খুব সংকীর্ণ থাকে। ধোঁকা খাই আমরা। বাহ্যিক চাল-চলন দেখে বলে দিই– অমুক বাদশাহ খুব দানশীল। এ বাদশাহর কাণ্ডটাও দেখুন। তিনি কাযী বুক্কারকে শুধু বরখাস্তই করলেন না, বরং তাঁর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠালেন, আমি আপনাকে এ পর্যন্ত যত হাদিয়া-তোহফা দিয়েছি, সব ফিরিয়ে দিন। কারণ, এখন আপনি আমার কাজ করছেন না; উপরন্তু আমার মতের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! দেখুন, এটা তো এক-দু বছরের ব্যাপার ছিলো না। বাদশাহ কখন কী হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন এর হিসাব রাখা কি সহজ ব্যাপার ছিলো? হিসাব রাখলেও এখন সব হাদিয়া ফেরত দেয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার? কিন্তু এ বুযুর্গ বাদশাহর প্রেরিত বাহককে নিয়ে গেলেন বাসার একটি কামরায়। সেখানে গিয়ে দেখা গেলো তালাবদ্ধ একটি আলমারি। তিনি সেটা খুললেন। বাহক দেখতে পেলো, থরে-থরে সাজানো বিভিন্ন থলে। থলেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বাহককে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বাদশাহর পক্ষ থেকে হাদিয়ার যেসব থলে আসতো, সবগুলো এখানেই রেখে দিয়েছি আমি। থলেগুলোর উপর যে সিল-লেবেল লাগানো ছিলো, এখনো হুবহু সেভাবেই আছে। একটি থলেও আমি খুলে দেখিনি। কেননা, যেদিন থেকে বাদশাহর সাথে আমার সম্পার্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই আমার হৃদয়ে ভাস্বর ছিলো, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَاعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ –

'বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব কর ধীরে-ধীরে। কেননা, তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে একদিন তোমার শত্রু।' তাই আমি আশঙ্কা করছিলাম, হয়তো একদিন আমাকে বাদশাহর এসব হাদিয়া ফেরত দিতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! বাদশাহর হাদিয়া আমি মোটেও খরচ করিনি।

একেই বলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এভাবেই আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এ দু'আ করতে থাক

সারকথা হলো, মহব্বত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া চাই। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এভাবে দু'আ করতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ – (كنز العمال ج ٢ ، ص ١٨٢)

'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ভালোবাসাকে জয়ী করুন। অন্যান্য ভালোবাসা যেন আপনার ভালোবাসার সামনে পরাজিত হয়– সেই তাওফীক দান করুন।'

মানুষ দুর্বল। তার সাথে রয়েছে মানবীয় দাবি ও কামনা। তাই এক মানুষ ভালোবাসে অন্য মানুষকে। যেমন– একজন মানুষ ভালোবাসে স্ত্রীকে, সন্তান-সন্ততিকে, বন্ধু-বান্ধবকে। এটা তার স্বভাবজাত। তাই দু'আ করতে হবে, যেন এসব ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কাছে পরাজিত থাকে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাই যেন হয় বিজয়ী ভালোবাসা।

উপচানো ভালোবাসার সময় এ দু'আ করবে

যদি কারো প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং অনুভূত হয় যে, ভালোবাসাটা সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছে, তখন সাথে সাথে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! এ ভালোবাসাটা আমার অন্তরে ঢেলেছেন আপনি। কিন্তু এ তো দেখি সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছে। হে আল্লাহ! এমন যেন না হয় যে, আমি ফেতনায় জড়িয়ে পড়ি। হে আল্লাহ, আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করুন এবং সম্ভাব্য ফেতনা থেকে রক্ষা করুন।

এই দু'আ করার পর নিজের ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডে সতর্কতা অবলম্বন করবে। আলোচ্য হাদীসের শিক্ষাগুলোর কথা মনে রাখবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার ও দুনিয়া আখেরাত সুন্দর হবে।

বন্ধুত্বের কারণে গুনাহ

আমরা অনেক সময় বন্ধুত্বের কারণে গুনাহের সাথে জড়িয়ে পড়ি এবং ভাবি, বন্ধুর আবদার রক্ষা করতে হবে, না হয় সে মনে কষ্ট পাবে। অথচ এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি কারো মন রক্ষা করতে দ্বীন-শরীয়তকে পদদলিত করতে হয়, তাহলে মানুষের মন রক্ষা নয় বরং শরীয়তকেই রক্ষা করতে হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কারো মন রক্ষা করতে গেলে শরীয়ত পালনে কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে যথাসম্ভব একজন মুসলমানের মন রক্ষা করা উচিত। কারণ, মুসলমানের মন রক্ষা করাও ইবাদত।

বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকুন

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) আলাচ্য হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলতেন, এ হাদীসে মুআমালাত তথা কাজ-কারবারের বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নিষেধ করা হয়েছে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে। বরং প্রত্যেকের সাথে উপযুক্ত ও সঙ্গত আচরণ করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদের সকলকে এ হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

সম্পর্ক ঠিক রাখো

"একটি ইমারত, কুড়াল ও দুরমুজ দ্বারা আঘাত করতে থাক, ভেঙ্গে পড়ে যাবে। দুদিনের মধ্যে সেখানে ধ্বংসলীলা দেখতে পাবে। কিন্তু এমন একটি ইমারত কি দুদিনে দাঁড় করানো সম্ভব হবে? মোটেও নয়। পারস্পরিক সম্পর্কও এমন, যা ভাঙ্গতে সময় লাগে না, কিন্তু গড়তে সময় লাগে।"

সম্পর্ক ঠিক রাখো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ عَجُوْزٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَيْفَ اَنْتُمْ ، كَيْفَ حَالُكُمْ ، كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا ؟ قَالَتْ بِخَيْرٍ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! تَقَبَّلْ هٰذِهِ الْعَجُوْزَ هٰذَا الْاِقْبَالَ ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ! اِنَّمَا كَانَتْ تَاتِيْنَا زَمَانَ خَدِيْجَةَ وَاِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِمِنَ الْاِيْمَانِ –

(بيهقى ، فى شعب الايمان)

হাদীসের সার

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একবারের ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এক বৃদ্ধা এলেন। রাসূল (সা.) তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। সমাদরের সাথে গ্রহণ করলেন। অত্যন্ত খাতির-যত্ন করলেন। সম্মানের সাথে তাকে বসালেন। ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধা যখন চলে গেলেন, তখন

আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যাকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন, কে সেই বৃদ্ধা? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন–

انَّمَا كَانَتْ تَاتِيْنَا زَمَانَ خَدِيْجَةَ

বৃদ্ধাকে তখন দেখেছিলাম, যখন খাদিজা (রা.) জীবিত ছিলেন। আমাদের ঘরে তখন তার আসা-যাওয়া ছিলো। খাদিজার বান্ধবী। তার সাথে খাদিজার ভালো সম্পর্ক ছিলো। তাই আমি তার সমাদর করলাম। তারপর রাসূল (সা.) বললেন– اَنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْاِيْمَانِ 'মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা ঈমানেরই অংশ।'

সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করবে

অর্থাৎ কারো সাথে সম্পর্ক তৈরি হলে সে সম্পর্ক যেন নিজের পক্ষ থেকে না ভাঙ্গে– যথাসম্ভব এ চেষ্টা করা একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় সম্পর্ক ঠিক রাখা কষ্টকর মন হয়। মনে চায় না সম্পর্কটা ধরে রাখতে। কিন্তু একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো এ পরিস্থিতিতেও সম্পর্ক ধরে রাখবে। সুতরাং তৈরি হওয়ার পর নিজের দিক থেকে তা ভাঙ্গবে না। যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তা টিকিয়ে রাখার। যদি এতে তোমার কষ্ট হয়, তাহলে বড়জোর এতটুকু করতে পার যে, তার সাথে মেলামেশা আগের তুলনায় কমিয়ে দিবে। কিন্তু একেবারে সালাম-কালাম বন্ধ করে দিবে না। কারণ, সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করে দেয়া একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখা

এ হাদীসে আমাদের জন্য দুটি শিক্ষা রয়েছে। প্রথম শিক্ষা– যাদের সাথে সম্পর্ক এক-দুদিনের নয়, বরং দীর্ঘদিনের। তাদের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখবে। একে কোনোভাবে নষ্ট হতে দিবে না। যেমন– পিতা-মাতা, স্ত্রী প্রমুখ। হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বাজান ইন্তেকাল করেছেন। এখন এই ভেবে আমি কষ্ট পাচ্ছি যে, তার তো কোনো খেদমত করতে পারলাম না। অনেকের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, মাতা-পিতা জীবিত থাকতে কদর করে না। ইন্তেকালের পর তার অনুভূতি জেগে ওঠে। তখন চিন্তা করে, হায়! কত বড় নেয়ামত আমি হারিয়ে ফেললাম। তাদের হক তো আদায় করতে পারলাম না। এ লোকটির মনেও এ অনুভূতি জেগেছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে জিজ্ঞেস

করলো, এখন আমি কী করবো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এখন তুমি তোমার পিতার বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের সাথে সদাচরণ করবে। পিতার সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত ছিলো, তাদের সাথে তেমন ব্যবহার করবে। এতে তোমার পিতার রূহ খুশি হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা পূর্বের ক্রটির ক্ষতিপূরণ দান করবেন। সুতরাং পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর কিংবা তোমার কোনো স্বজন মারা যাওয়ার পর তোমার দায়িত্ব হলো, তাদের আপনজন যারা জীবিত আছেন, তাদের সাথে সদাচরণ করা। এটাও ঈমানের অংশ। এমন যেন না হয় যে, যিনি মারা গিয়েছেন, তিনি সম্পর্কটাও সাথে করে কবরে নিয়ে গিয়েছেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর ব্যাপারটাই দেখো। তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বান্ধবীর সাথে সদাচরণ করছেন। তাঁর বান্ধবীদের বাড়িতে তিনি হাদিয়াও পাঠাতেন। এটাই ইসলামের শিক্ষা, আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা প্রথমত এ শিক্ষাটা পেলাম।

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সুন্নাত

দ্বিতীয় শিক্ষাটি হাদীসে উল্লিখিত حسن العهد শব্দ থেকে আমরা পাই। যার অর্থ– সম্পর্ক ঠিক রাখার প্রতি পরিপূর্ণ যত্ন নেয়া। অর্থাৎ সম্পর্কিত ব্যক্তির সাথে সব সময় সুন্দর আচরণ করে যাওয়া এবং নিজের পক্ষ থেকে তখনও সম্পর্ক ছিন্ন না করা। ধরে নেয়া যাক সম্পর্কিত ব্যক্তিটি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তবুও তার সাথে সম্পর্কটা ধরে রাখবে। যেহেতু এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। তাই সুন্নাত ও ইবাদত মনে করে তুমি সম্পর্কটা নষ্ট করো না।

নিজের একটি ঘটনা

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর সাথে এক লোকের পারিবারিক সম্পর্ক ছিলো। এমনিতে তিনি খুব নেক মানুষ ছিলেন। কিন্তু কিছু লোকের অভ্যাস থাকে কথায়– কথায় অন্যের দোষ ধরা। লোকটিরও এ বদ-অভ্যাস ছিলো। কারো সাথে সাক্ষাত হলেই তিনি তার একটা না একটা দোষ ধরে বসতেন। তার এ তিরস্কারের অভ্যাসের কারণে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলতো। একবার তিনি তার এ অভ্যাসটা আমার উপর প্রয়োগ করে বসলেন। আমাকে একটা কথা বলে বসলেন, যা সত্যিই সহনীয় ছিলো না। যদিও কথাটা আমি তার সামনে হজম করে নিলাম। কিন্তু সাথে সাথে এও ভাবলাম যে, লোকটি নিজেকে কী মনে করে? টাকা-পয়সা ও মান-সম্মানের গরমে তার কাছে কি কেউ মানুষ মনে

হয় না? তাই আমি বাড়িতে গিয়ে তার উদ্দেশ্যে চটজলদি একটি চিঠি লিখে ফেললাম। চিঠিতে এও লিখলাম, আপনার এ বদ-অভ্যাসটা অসহনীয়। এজন্য মানুষ আপনাকে ভালো চোখে দেখে না। আজ আপনি আমার সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তাও ছিলো আমার সহ্যের বাইরে। এ কারণে আমি ভবিষ্যতে আপনার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই না।

নিজের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ভেঙ্গো না

চিঠি তো লিখে ফেললাম। তবে আমার একটা অভ্যাস ছিলো এ জাতীয় কোনো বিষয় সামনে এলে অবশ্যই আব্বাজানের সামনে পেশ করতাম। তাই চিঠিটা আব্বাজানের খেদমতে পেশ করে ঘটনা খুলে বললাম। আমি এ সবই রাগের মাথায় করছি আব্বাজান তা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি চিঠিটা নিজের কাছে রেখে বললেন, ঠিক আছে এখন যাও। এ ব্যাপারে পরে কথা বলবো। এই বলে তিনি ব্যাপারটিকে পিছিয়ে দিলেন। পরের দিন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, তোমার চিঠিটা আমি পড়েছি। আচ্ছা বলো তো এর দ্বারা তুমি কী করতে চাচ্ছো? বললাম, আমি চাচ্ছি, চিঠিটা পাঠাবো এবং তার সাথে সম্পর্ক শেষ করে দেবো। আমার কথা শোনার পর আব্বাজান বললেন, দেখো, এটা কোনো লম্বা-চওড়া কাজ নয় যে এর জন্য তোমাকে সময় ব্যয় করতে হবে কিংবা কঠিন সাধনা করতে হবে। তবে সম্পর্ক তৈরি করা এমন কাজ, যা সব সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং এত তাড়াহুড়ো করছো কেন? চিঠিটা তাকে এখুনি দিতে হবে এমন তো কোনো কথা নয়, আরো কিছু দিন অপেক্ষা কর। দেখো কী হয়। হ্যাঁ, যদি তার সাথে মেলামেশা দ্বারা তোমার কাছে কষ্ট অনুভূত হয়, তাহলে তার কাছে যেও না। এই তো যথেষ্ট। চিঠি লিখে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া তো জরুরি নয়। এত ঘটা করে সম্পর্ক শেষ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সম্পর্ক ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন

তারপর তিনি বললেন, সম্পর্ক এমন এক বিষয়, যা যথাসম্ভব রক্ষা করতে হয়। সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ, তৈরি করা কঠিন। যদি তোমার মেজাজ ও রুচি তার সাথে খাপ না খায়, তাহলে তার কাছে যেও না। সকাল সন্ধ্যা তার কাছে যাওয়া-আসা করতে হবে এমন তো জরুরি নয়। সম্পর্ক যখন আছে, তাহলে তা তোমার পক্ষ থেকে নষ্ট করো না। এসব কথা বলার পর আব্বাজান দ্বিতীয় আরেকটি চিঠি বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন, এ চিঠিটা পড় আর

তোমার চিঠিটাও পড়। আমার চিঠিতেও অভিযোগের প্রকাশ ঘটেছে। তার আচরণ তোমার কাছে ভালো লাগেনি তাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ চিঠি দ্বারা সম্পর্ক শেষ করার ঘোষণা দেয়া হয়নি।

আমি আব্বজানের লিখিত চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখলাম, আমার চিঠি এবং তার চিঠির ভাষার মাঝে আসমান-জমিনের পার্থক্য বিদ্যমান। আমি লিখেছিলাম নিজের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য। আর তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত পালনের জন্য। তাঁর চিঠিতেও অভিযোগটা উঠে এসেছে, যা আমার চিঠিতেও এসেছিলো। তবে পার্থক্য হ.লো, আমারটাতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছিলো। তাঁরটাতে সেটা বলা হয়নি।

তারপর তিনি বললেন, দেখো, লোকটির সাথে সম্পর্ক অনেকদিন থেকে। তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, বরং সম্পর্কটা পারিবারিক। আমার আব্বাজান তথা তোমার দাদাজানের সময় থেকে এ সম্পর্কটা চলে আসছে। তাঁর আব্বা আর তোমার দাদা পরস্পর বন্ধু ছিলেন। এতো পুরনো একটি সম্পর্ককে মুহূর্তের ভেতর কেটে দেয়া মোটেই সঙ্গত হতে পারে না।

ইমারত ধ্বংস করা সহজ

যাই হোক, আব্বাজানের 'সম্পর্ক ভাঙ্গা সহজ, গড়া সহজ নয়' বাণীটি হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার মতো। বাণীটি ঠিক এরকম যেমন একটি ইমারত। যাকে কুড়াল ও দুরমুজ দ্বারা আঘাত করতে থাক, ভেঙ্গে পড়ে যাবে। দু'দিনের ভেতর সেখানে ধ্বংসলীলা দেখতে পাবে। কিন্তু এমন একটি ইমারত কি দু'দিনে দাঁড় করানো সম্ভব হবে? মোটেও নয়। সম্পর্কটাও এমন, যা গড়তে সময় লাগে, ভাঙ্গতে সময় লাগে না। সুতরাং সম্পর্ক ভাঙ্গার পূর্বে হাজার বার ভাবো। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, اَنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ সম্পর্কের প্রতি ভালোভাবে যত্ন নেয়া ঈমানেরই একটি দাবী।

যদি সম্পর্কের কারণে কষ্ট হয়

ধরে নেয়া যাক সম্পর্কের কারণে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তাহলে একথা ভাবো যে, এর দ্বারা তো তোমার মাকামও বুলন্দ হচ্ছে। সম্পর্কিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যত বেশি কষ্ট পাবে, তত তোমার দারাজাত বাড়তে থাকবে। সাওয়াব পেতে থাকবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন বান্দা যদি একটি কাঁটা দ্বারাও আঘাত পায়, তাহলেও আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়ান। সুতরাং কেউ তোমাকে কষ্ট দিলে ধৈর্যধারণ কর। এতে সাওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.)

বলেছেন, সম্পর্ক রক্ষা ঈমানের দাবী। এ হাদীসের উপর আমল করার নিয়তও কর। তাহলে সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তও কর। তাহলে সুন্নাতের উপর আমল করার সাওয়াবও লাভ করবে।

কষ্টে ধৈর্যধারণের পুরস্কার

আসলে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যদি ধৈর্য ধরতে পারো, তাহলে তা তোমার চিরস্থায়ী জীবনে কাজে আসবে। এর সাওয়াব তোমার সাথে কবরে যাবে। আল্লাহ তা'আলা পরকালে এর পুরস্কার দেবেন, যে পুরস্কারের তুলনায় দুনিয়ার এসব কষ্ট কিছুই নয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন যখন ধৈর্যশীলদেরকে পুরস্কার দেবেন, তখন দুনিয়াতে যারা আরামে ছিলো তারা আফসোস করে বলতে থাকবে, আহা! যদি দুনিয়াতে আমাদের চামড়াকে ফালি-ফালি করে কাটা হতো আর আমরা ধৈর্য ধরতাম, তাহলে আমরাও এসব সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত হতে পারতাম।

সম্পর্ক ঠিক রাখার অর্থ

এ সুবাদে সম্পর্ক ঠিক রাখার অর্থটাও বুঝে নাও। এর অর্থ হলো, সম্পর্কিত ব্যক্তির হক আদায় করতে থাক। এর জন্য এটা জরুরি নয় যে, তোমার অন্তর তার অন্তরের সাথে মিলে যাবে কিংবা সবদিক থেকে তুমি তাকে পছন্দ করে নিবে। এটাও জরুরী নয় যে, দিন-রাত তুমি তার সাথে হাসি-আড্ডায় মেতে থাকবে। বরং সম্পর্ক ঠিক রাখার অর্থ হলো, শরীয়ত তোমার উপর যেসব হক ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আরোপ করেছে, সেগুলো ঠিক মত আদায় কর। সুতরাং তোমার মনে চায় না তবুও তার কাছে যেতে হবে, তার কাছে বসতে হবে বা তার কথা শুনতে হবে-এসব জরুরী নয়। বরং জরুরী হলো তার হক আদায় করা। তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা। সম্পর্ক ঠিক রাখার এটাই অর্থ। এটাই ঈমানের দাবী।

সুন্নাত ছাড়ার পরিণাম

এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আমরা রাত-দিন কত ঝগড়া করি। মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত, হিদায়াত ও শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই এত সব ঝগড়া-বিবাদ। যদি পূর্বের বয়ানের হাদীসটি এবং আজকের বয়ানের হাদীসটিকে আমরা একই পাল্লায় রাখি এবং উভয় হাদীসের মর্ম বুঝে নিয়ে

আমল করতে থাকি তাহলে আমাদের সমাজের অসংখ্য বিবাদ এমনিতে মিটে যাবে। গত বয়ানে বলা হয়েছে, ভালোবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নয়, শৈথিল্য প্রদর্শনও নয়; বরং অবস্থান কর মাঝামাঝিতে। মূলত শরীয়তের সব কাজেই মধ্যপন্থার গুণ বিদ্যমান। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে, সম্পর্ক জুড়ে রাখ। অর্থাৎ শরীয়ত নির্দেশিত সম্পর্ক ভেঙ্গোনা; বরং রক্ষা করে চলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ শিক্ষার উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মৃতদের দোষচর্চা করো না

"মৃত ব্যক্তি যখন চলে গেলো আল্লাহর কাছে, এমনও তো হতে পারে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। অথচ আপনি তো তার দোষচর্চায় মেতে আছেন! সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়—আপনি বলতে চাচ্ছেন, হে আল্লাহ! আপনি যাকে মাফ করেছেন, সে তো মানুষ হিসাবে ভালো নয়। 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই' বলুন! আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার এমন অভিযোগভাব আপনার গুনাহর উত্তাপকে আগে বাড়িয়ে দিবে না? এ জন্যই মৃতব্যক্তির দোষচর্চা শুধু গুনাহ নয়; বরং ডাবল গুনাহ।"

মৃতদের দোষচর্চা করো না

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْه، وَنَعُوْذُ بِاللّٰه مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِه وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَتَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ فَتُوْذُوْالْاَحْيَاءَ -

(ترمذى، كتاب البر ، باب ماجاء فى الشتم)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মৃতদেরকে মন্দ বলো না। কেননা, এর দ্বারা কষ্ট পায় জীবিতরা। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)।

অপর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكَفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ – (ابوداود و، كتاب الادب)

মৃতদের ভালো দিকগুলো আলোচনা কর, তাদের মন্দগুলো থেকে বিরত থাক।

আলোচ্য দুটির মর্ম কাছাকাছি, অর্থাৎ মৃতদের ব্যাপারে ভালো বলা এবং মন্দ না বলা–এমনকি তাদের বাহ্যিক দিকগুলো খারাপ হলেও তা না বলা।

যা অসম্ভব

প্রশ্ন হতে পারে, বিধানটি তো জীবিতদের বেলায়ও প্রযোজ্য। জীবিতদের ব্যাপারেও 'ভালো' বলা চাই এবং 'মন্দ' না বলা চাই। কেননা, মন্দ বলা মানেই গীবতের পসরা খুলে যাওয়া। গীবত হারাম। সুতরাং আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে মৃতদের ব্যাপারে বিশেষভাবে বলা হলো কেন?

এর উত্তর হলো, জীবিতদের গীবত হারাম। কিন্তু মৃতদের গীবত শুধু হারাম নয়; ডাবল হারাম। হারামে হারামে ব্যবধান রয়েছে। তাই 'মৃতদের 'মন্দ' বলোনা'-বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কেন এ ব্যবধান? এর কারণ হলো-প্রথমত, জীবিত ব্যক্তির গীবত করলে তা মাফ করে নেয়া সম্ভব। যেমন-সাক্ষাতে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব এবং এভাবে গুনাহটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। কেননা, গীবত বান্দার হক-সংশ্লিষ্ট একটি গুনাহ। আর বান্দার হকের ব্যাপারে একটি মূলনীতি হলো, এমন হক পদদলিত করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ চেয়ে নিতে হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ করলে তা মাফ হয়ে যায়। বলুন, মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি এ মূলনীতি চালানো যাবে? হারিয়ে যাওয়া মানুষটির কাছে কি মাফ চাওয়া যাবে? তিনি তো চলে গেছেন আল্লাহর কাছে, সুতরাং 'মাফ চাওয়া' আর সম্ভব নয়। এজন্যই তার গীবত মানেই 'মাফ চাওয়ার পথ বন্ধ' এমন গুনাহতে লিপ্ত হওয়া। এদিক থেকে গুনাহটির তেজ দু'গুণ হয়ে গেলো।

আল্লাহর সিদ্ধান্তে বান্দার অভিযোগ

দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তি যখন চলে গেলো আল্লাহর কাছে, এমনও তো হতে পারে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন; অথচ আপনি তার দোষচর্চায় মেতে আছেন। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায়-আল্লাহর সিদ্ধান্তে আপনি সন্তুষ্ট নন। আপনি বলতে চাচ্ছেন, হে আল্লাহ! আপনি যাকে মাফ করেছেন, সে তো 'মানুষ' হিসাবে ভালো নয়। সুতরাং মনে হয় আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। আপনি সিদ্ধান্তে ভুল করতে পারেন, কিন্তু আমি ভুল করতে পারি না। তাই আমি তাকে মাফ করবো না। 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই' বলুন! আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কি গুনাহর উত্তাপকে আরো বাড়িয়ে দেয় না? এজন্যই মৃত ব্যক্তির দোষচর্চা শুধু গুনাহ নয়; বরং ডাবল গুনাহ।

জীবিত ও মৃত এক নয়

তৃতীয়ত, জীবিত ব্যক্তির গীবত ক্ষেত্রবিশেষে জায়েয। যেমন-এক ব্যক্তি দুর্নীতিবাজ, যার খপ্পরে যে কোনো সরল মানুষ পড়ে যেতে পারে। কিংবা সে

কাউকে কষ্ট দিতে পারে। বাস্তবতা যদি এমন হয়, তাহলে আপনি তার এ দোষটির কথা তাকে জানাতে পারেন যে, লোকটি এ ব্যক্তির খপ্পরে পড়তে যাচ্ছে। এটা গীবত হবে না; বরং এক মুসলমান ভাইকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে উদ্ধার করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মারা গেলো, সে তো আর কাউকে ধোঁকা দিতে পারবেনা। কারো সঙ্গে দুর্নীতি করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তার দোষচর্চা করা যাবে না। কাউকে বলা যাবে না যে, অমুক মারা গেছে; কিন্তু সে এই দোষে দোষী ছিলো। এরূপ বললে এটা হবে মৃতব্যক্তির দোষচর্চা। যে দোষচর্চাতে কারো কোনো উপকার নেই। তাই হাদীসটিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, মৃতব্যক্তির দোষচর্চা করোনা।

কষ্ট পায় জীবিতরা

চতুর্থত, মৃত ব্যক্তি তো এখন আর নেই। সুতরাং আমার দোষচর্চা দ্বারা তার কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি সে তো জানতেও সক্ষম নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন! সে মারা গেছে ঠিক, তবে তার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব তো মারা যায়নি। কাজেই আপনি যখন তাকে 'মন্দ' বলবেন, তখন তার তো কোনো ক্ষতি হবে না, তবে কষ্ট পাবে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। যাদের সংখ্যা এক-দু'জন নয় বরং অনেক। সুতরাং আপনার এই আচরণে নষ্ট হবে অনেকের হক। যাদের প্রত্যেকের কাছে আপনাকে যেতে হবে, মাফ চাইতে হবে। কারণ, এটা তো বান্দার হক। আগেই বলেছি, বান্দার হক নষ্ট করলে মাফ চেয়ে নিতে হয়। এবার আপনি কতজনের কাছে যাবেন? আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেওয়া? তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত হাদীসে আমাদেরকে এ গ্যাড়াকল থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, মৃতদের মন্দ বলো না।

মৃত ব্যক্তির গীবত যখন জায়েয

হ্যাঁ, একটিমাত্র অবস্থায় মৃত ব্যক্তির দোষের কথা বলা যাবে। তাহলো, সে যদি এমন কিতাব লিখে যায়, যেখানে রয়েছে ভ্রষ্টতার উৎস। যে কিতাবটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ তা পড়ে পথহারা হয়, তাহলে তার এ ভ্রষ্টতার কথা মানুষকে জানানো যাবে। গোমরাহী থেকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যই মানুষকে তা বলতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বলাবলিতে বাড়াবাড়ি না

হয়। তাকে গালমন্দ করা যাবে না। অশালীন কোনো মন্তব্য তার ব্যাপারে করা যাবে না। এমনটি বলা যাবে না যে, সে তো জাহান্নামী। বরং বলা যাবে যতটুকু ভ্রষ্টকথা তার লেখনীতে রয়েছে ঠিক ততটুকু। কারণ, এমনও তো হতে পারে, লোকটি যদিও লিখেছে একখানা ভ্রষ্ট কিতাব, কিন্তু মৃত্যুর আগে তার তওবা নসিব হয়েছিলো, ফলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। তাছাড়া কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী এ ফয়সালা তো আল্লাহ করেন। আমি আর আপনি এ ফয়সালা দিতে পারি না। সুতরাং 'জাহান্নামী' মার্কা শব্দ তার ব্যাপারে বলা যাবেনা।

'ভালো' বললে মৃতদের লাভ

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু এতটুকু বলেননি যে, মৃতদের দোষচর্চা করোনা। বরং পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন– তাদের ভালো দিকগুলোর বিবেচনায় তাদেরকে 'ভালো' বলো। এর কারণ কী?

আমি আমাদের কোনো কোনো বুযুর্গ থেকে শুনেছি, এর হেকমত হলো, যখন কোনো মুসলমান তার মৃত কোনো ভাইয়ের ব্যাপারে 'ভালো' মন্তব্য করে, তখন তা মৃত ব্যক্তির জন্য একটি সাক্ষী হয়ে যায়। আর এরই ভিত্তিতে অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা মৃতকেও মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন, আমার এক নেক বান্দা তোমাকে 'নেক' বলেছে, সুতরাং চলো, আমিও তোমাকে 'নেক' বানিয়ে নিলাম। তোমাকে মাফ করে দিলাম। অতএব, এর দ্বারা ফায়দা হলো কার? মৃত ব্যক্তির। আর আপনার একটি মন্তব্যে যদি আল্লাহর এক বান্দার ফায়দা হয়, তাহলে এমনও তো হতে পারে যে, তার বরকতে আল্লাহ আপনাকেও মাফ করে দিবেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যারা মারা গেছে, তাদের দোষগুলো নয়, বরং গুণগুলো আলোচনা কর। এতে 'ইনশাআল্লাহ' মৃতদেরও ফায়দা হবে, তোমরাও ফায়দা পাবে।

মৃতদের জন্য দু'আ কর

একই মর্ম বোঝায় এমন আরেকটি হাদীস ভিন্ন শব্দে, যা বর্ণনা করেছেন আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لَاتَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ – (نسائى ، كتاب الجنائز)

'মৃতদের আলোচনা শুধু কল্যাণের সাথে কর।' এখানে 'ভালো' ও 'কল্যাণ' শব্দটি ব্যাপক। দু'আও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের জন্য শাস্তিমুক্তির দু'আ কর। বলো, হে আল্লাহ! তাদেরকে শাস্তি থেকে নাজাত দিন। তাদেরকে মাফ করে দিন। আযাব থেকে রক্ষা করুন। এ জাতীয় দু'আ দ্বারা ফায়দা হয় দ্বিগুণ। প্রথমত দু'আ নিজেই একটি ইবাদত। যে কোনো দু'আই সাওয়াবের প্রাচুর্যে ভরা একটি ইবাদত। দ্বিতীয়ত, কোনো মুসলমানের উপর অনুগ্রহ করা ইবাদত। সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে আপনার তো ফায়দা, তারও ফায়দা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের উপর অনুগ্রহ করুন। সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

তর্ক-বিবাদ ও মিথ্যাচার : প্রয়োজন এড়িয়ে চলা

"বর্তমান সমাজে মিথ্যাকে মনে করা হয় শিল্প। সাধারণ-অসাধারণ এমনকি পীর-বুযুর্গের সাথে উঠা-বসা করে এমন লোকও বর্তমানে অনায়াসে মিথ্যা বলে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-কারখানায় মোটকথা জীবনের সকল অঙ্গনে মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানো, মিথ্যা বিবরণ দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বর্তমানে সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি এও বলতে শোনা যায়, দুনিয়াতে চলতে মিথ্যা ছাড়া উপায় নেই, সত্যের ভাত নেই।

আরেকটি আপদের নাম তর্ক-বিবাদ। বর্তমানের মানুষ এ ব্যাপারে খুব উৎসুক। কিছু মানুষ একত্র হলে এবং সেখানে কোনো বিষয় উঠে এলেই শুরু হয় তর্ক-বিবাদ। যাতে না থাকে পার্থিব লাভালাভ, না থাকে পররকালীন কোনো কল্যাণ।"

তর্ক-বিবাদ ও মিথ্যাচার : প্রয়োজন এড়িয়ে চলা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَيُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْاِيْمَانَ كُلَّهُ حَتّٰى يَتْرُكَ الْكِذْبَ فِى الْمَزَاحَةِ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا –

(مسند احمد ج ٢، ص ٣٥٢)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

পরিপূর্ণ ঈমানের দুটি আলামত

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাসি-কৌতুকের মাঝেও মিথ্যা ছাড়বে না এবং তর্ক-বিতর্ক ছাড়বে না, যদিও সে রয়েছে সঠিক অবস্থানে।

হাসি-কৌতুকে মিথ্যা বলা

হাদীসটিতে দুটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমত মিথ্যা না বলা। এখানে কৌতুকের মাঝে মিথ্যা না বলার কথা সবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, অনেকের ধারণা, মিথ্যা হারাম হয় তখন, যখন সিরিয়াসনেসের সাথে বলা হয়। কৌতুকচ্ছলে মিথ্যা বলা যেতে পারে। এজন্যই যদি বলা হয়, জনাব! আপনি অমুক সময় যা বলেছেন তা সত্য নয়, বরং মিথ্যা, তখন উত্তর দেয়া হয়, আমি তো সিরিয়াসলি বলিনি। সেটা তো মজা করার জন্য বলেছিলাম। যার অর্থ দাঁড়ায়, মজা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা হারাম নয়। অথচ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, অবাস্তব কথা বলা কোনো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এমনকি কৌতুকচ্ছলেও অবাস্তব কিছু বলা যাবে না। কৌতুককে ইসলাম নিষেধ করেনি; বরং ইসলাম এর প্রতি মৃদু উৎসাহ দিয়েছে। একজন মানুষ সব সময় নীরসভাবে বসে থাকা, চোখে-মুখে সব সময় রসহীনভাব লেগে থাকা, এমনকি মুসকি হাসিও ভুলে যাওয়া ইসলাম সমর্থন করেনা। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)ও কৌতুক করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কৌতুক ছিলো এতই সূক্ষ্ম অথচ রসালো, যা মনোহর হলেও অবাস্তব ছিলো না মোটেও।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কৌতুক

হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আমাকে একটি উট দিন। ওই যুগে উট ছিলো খুব দামী সম্পদ। যার কাছে যত বেশী উট থাকতো, তাকে তত বড় সম্পদশালী মনে করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকটিকে বললেন, আমি তোমাকে উটনির একটি বাচ্চা দেবো। লোকটি বললো, আল্লাহর রাসূল! আমার তো দরকার সফরের কাজে আসে এমন উট। বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে উটটি আমি তোমাকে দেবো সেটিও একটি উটনির বাচ্চাই বটে!

(মিশকাত পৃঃ ৪১৬)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) কৌতুক করেছেন, হাসির কথা বলেছেন– তবে মিথ্যা বা অবাস্তব বলেননি।

আরেকটি চমৎকার ঘটনা

আরেকটি হাদীস– এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দু'আ করুন, আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা.)

উত্তর দিলেন, বুড়া মানুষ জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা মর্মাহত হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা লক্ষ্য করে বললেন, আমি বলতে চাচ্ছি– কোনো মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না, বরং যুবক-যুবতী হয়ে জান্নাতে যাবে।

(মিশকাত পৃ. ৪১৬)

উক্ত দু'টি ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কৌতুক করা সুন্নাত। সুতরাং সুন্নাতের নিয়তে কৌতুক করলে 'ইনশাআল্লাহ' সাওয়াব পাওয়া যাবে। আমাদের অতীত বুযুর্গগণ কখনও নিরস ছিলেন না। বরং তাঁদের অধিকাংশই হাসি-মজার কথা বলতেন। কোনো-কোনো বুযুর্গ তো রসিক মানুষ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তারা কৌতুকের সময় মিথ্যা বলতেন না। মূলত আল্লাহ যার উপর দয়া করেন, তাদের যবান সর্বাবস্থায় মিথ্যা থেকে পবিত্র থাকে।

হযরত হাফেজ যামিন শহীদের কৌতুক

থানাভবনে প্রসিদ্ধ তিনজন কুতুব ছিলেন। একজনের নাম ছিলো হাফেয যামিন শহীদ। উঁচু মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কোনো কোনো বুযুর্গের দিব্যদৃষ্টি ছিলো এই–১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদের তিনি নেপথ্য নায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁর দরবারের অবস্থা ছিলো অন্যরকম। সবসময় সেখানে হাসি-কৌতুক লেগে থাকতো। কেউ তাঁর দরবারে গেলে বলতেন, ভাই! কেউ ফতওয়া জানতে চাইলে মাওলানা শেখ মুহাম্মদ থানবীর কাছে যাও। এখান থেকে একটু সামনে এগুলেই তাকে পাওয়া যাবে। যদি যিকর-আযকার শিখতে চাও এবং বাই'আত হতে চাও, তাহলে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর দরবারে চলে যাও। আর যদি হুক্কা পান করতে চাও, তাহলে দোস্তদের সাথে এখানে শরীক হয়ে যাও। এভাবেই তিনি কৌতুকমাখা কথা বলতেন এবং হাস্যরসের পর্দা দ্বারা নিজের উচ্চ মাকাম লুকিয়ে রাখতেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন ও হাস্যরস

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.)। যিনি ছিলেন একজন বড় মাপের তাবিঈ। তার ব্যাপারে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন–

كُنَّا نَسْمَعُ ضِحْكَهُ فِى النَّهَارِ وَبُكَاءَهُ بِاللَّيْلِ –

অর্থাৎ দিনের বেলায় আমরা তার হাসির আওয়াজ শুনতে পেতাম এবং রাতের বেলা শুনতে পেতাম কান্নার আওয়াজ। তিনি আল্লাহর সামনে সিজদা দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

হাদীসে বিনোদনের প্রতি উৎসাহদান

মোটকথা, হাস্যরস মূলত খারাপ কিছু নয়। তবে শর্ত হলো সীমার ভিতরে থাকতে হবে এবং সবসময় পেছনে পড়ে থাকা যাবেনা বরং হাস্যরস করতে হবে মাঝে মাঝে। যেমন রাসূল (সা.) এক হাদীসে বলেছেন–

رَوِّحُوْ الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً —

'মনকে মাঝে-মধ্যে আরাম দাও।'

অর্থাৎ সবসময় বাইন্ডিংয়ের ভেতর নয়, বরং মাঝে-মধ্যে একটু হাসি-কৌতুকের জন্য সময় বের করে নেবে। বোঝা গেলো, মাঝে মধ্যে এক-আধটু বিনোদন করাও সুন্নাত। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে মুখ থেকে যেন ভুল কথা বের না হয়। এসময় মিথ্যা ও অবাস্তব কোনো কথা বলা যাবে না। জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয; কিন্তু কৌতুকের জন্য তা নাজায়েয।

আবুবকর (রা.) এর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার ঘটনা

হিজরতের সময় যখন আবুবকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন, তখন মক্কার কাফের গোষ্ঠি উভয়কে গ্রেফতার করার জন্য গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলো। সাথে-সাথে এও ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো– যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গ্রেফতার করতে পারবে, তাকে একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে। সেই পরিস্থিতিতে মক্কার সকল কাফিরই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খোঁজ করার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলো। পথিমধ্যে আবুবকর (রা.)-এর সাথে এমন এক লোকের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো, যে কেবল আবুবকর (রা.)-কে চিনতো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চিনতো না। লোকটি আবুবকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সঙ্গীটি কে? সে সময় আবুবকর (রা.) মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। কারণ, এতে শত্রুপক্ষ টের পেলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তিনি সত্য কথা বলেন, তাহলে রাসূল (সা.)-এর জীবনের উপর হুমকি আসে। অন্যদিকে মিথ্যাও বলতে পারছেন না। এ ধরনের বিপদমুহূর্তে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই পথ বের করে দেন। হযরত আবুবকর (রা.) উত্তর দিলেন–هَادٍ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ 'পথপ্রদর্শক। আমাকে পথ দেখাচ্ছেন।'

হযরত আবুবকর (রা.) এমন এক কথায় উত্তর দিলেন, যা শুনে লোকটি ভাবলো, মরুভূমিতে সফরকালে লোকেরা যেমনিভাবে একজন পথপ্রদর্শক সাধারণত রাখে, ইনিও হয়ত সেরকমই একজন। কিন্তু আবু বকর (রা.) অন্তরে

ছিলো ধর্মের পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথপ্রদর্শক।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এমন কঠিন মুহূর্তে তো মিথ্যা বলা জায়েয ছিলো। অথচ আবু বকর (রা.) সতর্কতার সাথে মিথ্যাকে বর্জন করে এমন শব্দে উত্তর দিলেন যে, প্রয়োজনও মিটে গেলো এবং মিথ্যাও বলতে হলোনা।

মাওলানা কাসেম নানুতুবীর ঘটনা

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৫৭ সালের ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। এ আজাদী আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলো, ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানার হুকুম দিয়ে দিলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলানো হলো। প্রতিটি মহল্লায় তথাকথিত আদালত কায়েম করে ইংরেজ মেজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলো। যেখানে যাকেই সন্দেহ হতো, তাকেই এ সাজানো আদালতে হাজির করা হতো। আদালতও বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিতো–একে ফাঁসি দিয়ে দাও। সাথে-সাথে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

এ পরিস্থিতিতে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দ-সংলগ্ন ছাত্তাহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। ইংরেজ পুলিশ তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে চলে যায়। মসজিদের ভেতর হযরত একাই ছিলেন। পুলিশের ধারণা ছিলো, এত বড় আলেম যিনি, নিশ্চয় তিনি জুব্বা-পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় শানদার মসনদে বসে থাকেন। অথচ তাঁর পরনে তখন ছিলো মামুলি একটি লুঙ্গি ও গায়ে ছিলো সাধারণ একটি জামা। তাই পুলিশের লোকেরা তখন তাঁকে চিনতে পারেনি। তারা তাঁকে দেখে ভেবে নিলো, এ বোধ হয় মসজিদের খাদেম হবে। এজন্য তারা তাঁকেই প্রশ্ন করলো, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী কোথায়? হযরত নানুতুবী যেখানে ছিলেন, সাথে-সাথে সেখান থেকে এক কদম পিছিয়ে গিয়ে বললেন, একটু আগেও মাওলানা নানুতুবী এখানে ছিলেন। এ উত্তর দ্বারা তিনি তাদেরকে বোঝাতে চাইলেন, তিনি এখন এখানে নেই। অথচ 'এখানে নেই' কথাটি তিনি সরাসরি বললেন না। জীবন-মরণের প্রশ্ন যেখানে, সেখানেও তিনি সরাসরি মিথ্যা বললেন না। এর বরকতে আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করলেন। পুলিশের লোকেরা ভাবলো, একটু আগেও তিনি ছিলেন অর্থ এখন তিনি এখানে নেই। হয়ত পালিয়ে গেছেন। সারকথা হলো, একজন ঈমানদার কঠিন মুহূর্তে মিথ্যা বলা পছন্দ করেন না।

বর্তমান সমাজে মিথ্যার ছড়াছড়ি

সুতরাং যথাসম্ভব মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা একজন মুসলমানের কর্তব্য। ইসলাম যেহেতু সত্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং মিথ্যা থেকে নিষেধ করেছে, এমনকি হাসি-কৌতুকের মোড়কেও মিথ্যা বলা যাবে না বলে স্পষ্ট বিধান দান করেছে, তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় মিথ্যা বলার তো কোনো অবকাশই নেই। অথচ আমাদের বর্তমান সমাজ মিথ্যাকেই মনে করে শিল্প। সাধারণ-অসাধারণ সকলেই এমনকি বুযুর্গদের সাথে উঠা-বসা করে এমন লোকেও বর্তমানে অনায়াসে মিথ্যা বলে থাকে। যেমন– ছুটি নেয়ার জন্য জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে ফেলে। একটুও ভাবেনা যে, এটাও মিথ্যার শামিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-কারখানায় মোটকথা জীবনের সকল অঙ্গনে মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানো, মিথ্যা বিবরণ দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বর্তমানে সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি এও বলতে শোনা যায় যে, এ দুনিয়াতে সত্যের ভাত নেই, মিথ্যা ছাড়া উপায় নেই। আল্লাহ মাফ করুন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكْ

'সত্যে মুক্তি। মিথ্যায় ধ্বংস।'

মূলত মিথ্যা সাময়িক ফায়দা দিতে পারে, কিন্তু এর পরিণাম হয় ভয়াবহ। মুক্তি সফলতা তো সত্যের মাঝেই রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে সত্য। কৌতুকের মাঝেও মিথ্যা বলা যাবে না। এটাই আলোচ্য হাদীসের প্রথম নির্দেশ।

তর্ক-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকুন

আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, তর্ক-বিবাদে জড়িয়ে পড়োনা, যদিও তুমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আমাদের যবানের কিছু 'আপদ' আছে। অন্যতম আপদের নাম বহস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিবাদ। মানুষ এ ব্যাপারে খুবই উৎসুক। কিছু মানুষ একত্র হলে এবং সেখানে কোনো বিষয় উঠে এলেই শুরু হয় তর্ক-বিবাদ। তখন এমন কথাও চলে আসে, যার মাঝে পার্থিব কিংবা পরকালীন ফায়দা বলতে কিছু থাকে না। মূলত তর্ক-বিবাদ মানুষের আত্মিক শক্তিকে বিনাশ করে দেয়। ইমাম মালিক (রহ.) বলতেন–

اَلْمِرَاءُ يُذْهِبُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ

'যুক্তিতর্ক ইলমের নূরকে ধ্বংস করে দেয়।'

এ রোগটা আলেমদের মাঝে বেশি। তর্ক-বিবাদ যেমন মৌখিক হয়, অনুরূপভাবে লিখিতও হতে পারে।

নিজের রায় ব্যক্ত করে কেটে পড়ুন

সোজাসুজি কথা হলো, আলেমদের উচিত এ ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে সতর্ক থাকা। আপনি যদি কারো কোনো অভিমত সমর্থন করতে না পারেন, তাহলে সরাসরি বলে দিন, এ ব্যাপারে আমি একমত নই। তারপর ধীরে-সুস্থে বিপরীত মতটাও শুনুন। বুঝে এলে গ্রহণ করুন। অন্যথায় বলুন, বিষয়টার সাথে যেহেতু আমি একমত হতে পারছি না, তাই আপনি আপনার মতের উপর আমল করুন আর আমার মতের উপর আমি আমল করবো। তারপর কেটে পড়ুন। যুক্তিতর্কে জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। যদি মনে করেন আপনার মতই সঠিক, তাহলেও যুক্তিতর্ক থেকে এড়িয়ে চলুন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমার অবস্থান সঠিক হলেও যুক্তিতর্ক পরিহার কর। সুতরাং এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত।

সূরা কাফিরূন কেন নাযিল হলো?

সূরা কাফিরূন আমরা নামাযে তেলাওয়াত করি। সূরাটি এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নাযিল হয়। তা এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফেরদের সামনে তাওহীদের পয়গাম পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন এবং স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণও পেশ করেছিলেন। তারপর পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যুক্তিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। তখনই সূরাটি নাযিল হয়–

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ০ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ০ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ০ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ০ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ০ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ০ (سورة الكافرون)

"বলুন, হে কাফেরকুল! আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।"

অর্থাৎ– আমি যুক্তিতর্কে যেতে চাইনা। হক ও ন্যায়ের পক্ষের দলীল-প্রমাণ তো আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছি। কবুল করতে চাইলে নিজেদের কামিয়াবির সাথেই কবুল কর। এরপরেও যুক্তিতর্কে জড়ানো তোমাদের জন্য লাভজনক নয়; আমার জন্যও নয়। لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের কাছে আর আমারটা আমার কাছে।

গ্রহণ কর, না হয় কেটে পড়

দেখুন, এ ছিলো ইসলাম ও কুফরের লড়াই। অথচ এক্ষেত্রেও আল্লাহ বলেছেন, ঝগড়া করোনা, যুক্তিতর্কে যেওনা। সুতরাং অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রে তো যুক্তিতর্কে জড়ানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ আমরা যেন এটা ছাড়া স্থির থাকতে পারিনা। এটা উচিত নয়। এটা ভেতরের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। বিতর্কে না গিয়ে বরং সত্যটা জানার নিয়তে কথা বলুন। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করুন। বিপরীত রায়ও মনোযোগসহ শুনুন। বুঝে ধরলে তা গ্রহণ করুন, না হয় কেটে পড়ুন। তবুও বিতর্কে যাবেন না।

আমার কাছে অনেক লোক চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করে যে, অমুকের সাথে এ মাসআলা নিয়ে বহস হয়েছে। তিনি এ দলীল পেশ করবেন, আমরা এর কী জবাব দেবো?

আজ হয়ত আমি একটা জবাব দিলাম, কিন্তু লোকটি যদি আবার আরেকটি দলীল পেশ করে, তাহলে আমার কাছে হয়ত আবার আরেকটি জবাব চাওয়া হবে। বলুন এভাবে এ ধারা কতদিন চলতে থাকবে? এভাবেই তো শুরু হয় ঝগড়া-বিবাদের ধারা। এটা সুন্নাত-পদ্ধতি নয়। সুন্নাত-পদ্ধতি হলো, সঠিক কথাটা তাকে জানিয়ে দিন। মানলে ভালো আর না হয় তার কর্মফল তার কাছে আর আপনার কর্মফল আপনার কাছে। যুক্তিতর্কে জড়ানোর প্রয়োজন নেই।

মুনাযারা মঙ্গল আনতে পারে না

বর্তমানে মুনাযারা করা একটি বিশেষ বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্যকে হারিয়ে দেয়াকে একটা কিছু মনে করা হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) যখন তরুণ ছিলেন, দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সদ্য ফারেগ হয়েছিলেন, তখন বিভিন্ন বাতিল ফেরকার সাথে মুনাযারা করার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তাই ফারেগ হওয়ার বেশ কিছুকাল এ ধারা চালু রাখেন। মুনাযারায় তার সাথে কেউ পেরে উঠতোনা। আল্লাহ তাঁকে মুনাযারার এক বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই বলেন, মুনাযারার বিষয়টি আমার অন্তরে আর নেই। একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে। কেননা, মুনাযারার সময় অন্তরে এক প্রকার অন্ধকার অনুভব করি। এরপর থেকে সারাজীবন কারো সঙ্গে মুনাযারা করিনি। বরং অন্যান্যদেরকে নিষেধ করে আসছি। আসলে এতে কোনো ফায়দা নেই। হ্যাঁ, কোথাও যদি মুনাযারা করা ছাড়া সত্য প্রকাশের কোনো সুযোগ না থাকে, সেটা ভিন্ন কথা। তাই বলে এর পেছনে পড়ে থাকা যাবে না। আলেমদের জন্য যদি এটি মঙ্গলজনক না হয়,

তাহলে সাধারণ মানুষ দ্বীনের কোনো মাসআলার ব্যাপারে বিতর্কে জড়ানোর কোনো প্রশ্নই উঠে না।

বিতর্কে কারা জড়ায়?

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ উর্দু কবি আকবর ইলাহাবাদী চমৎকার বলেছেন–

مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں

فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

'ধর্মীয় বিতর্ক আমি কখনও করিনি। ফালতু বুদ্ধি আমার মাঝে কখনও ছিলোনা।' অর্থাৎ ফালতু বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই মূলত বিতর্কে লিপ্ত হয়।

বিতর্ক অন্ধকার সৃষ্টি করে

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন–

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث و مباحثہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے اور اسی لئے تم اہل طریقت کو دیکھو گے کہ وہ بحث و مباحثہ سے سخت نفرت کرتے ہیں

অর্থাৎ– এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, বিতর্ক দ্বারা অন্ধকার তৈরি হয়। কেননা, ঈমানের অপূর্ণাঙ্গতাই তো অন্ধকার। আর এজন্যই তোমরা হকপন্থীদের দেখবে যে, তারা বিতর্ককে খুব ঘৃণা করে।

জনাব মওদূদীর সাথে বিতর্ক

হযরত থানবী (রহ.)-এর সোহবতপ্রাপ্ত এক বুযুর্গ হযরত বাবা নাজম আহসান (রহ.)। বিরল স্বভাবের এই বুযুর্গ একদিন আমাকে বললেন, 'জনাব মওদূদী তাঁর 'খেলাফত ও মুলুকিয়্যাত' নামক কিতাবটিতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে তুমি কিছু একটা লিখো।'

তাই আমি এর উপর একটি প্রবন্ধ লিখে দিলাম। তারপর মওদূদী সাহেবের পক্ষ থেকে এর জবাব দেয়া হলো, আমিও তার পাল্টা জবাব লিখলাম। এভাবে জবাব-পাল্টা জবাব সর্বমোট দুবার হলো। বাবা নাজম আহসান (রহ.) আমার দ্বিতীয় জবাব পড়ে আমাকে একটি চিরকুট লিখলেন। চিরকুটটি আজও আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি। তিনি লিখেছেন–

میں تمہارا یہ مضمون پڑھا اور پڑھکر بڑا دل خوش ہوا اور دعا ئیں نکلیں اللہ تعالے اسکو قبول فرمائے

'তোমার প্রবন্ধ আমি পড়েছি। খুব খুশি হয়েছি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'আও করেছি। 'আল্লাহ কবুল করুন।' তারপর তিনি লিখলেন–

اب اس مردہ بحثا بحثی کو دفنا دیجئے

'এবার দ্বিতীয়বারে আমার যা বলার আমি বলে দিয়েছি। সেখানে হক বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখা হয়েছে। সুতরাং এরপর যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব আসে, তাহলে আমি যেন পুনরায় তার জবাব না দিই। আল্লাহর ওলীরা বিতর্ককে এভাবেই ঘৃণা করতেন। কেননা, এতে কোনো ফায়দা নেই। যুক্তিতর্কের ফলে হক গ্রহণ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং এতে শুধু সময় নষ্ট হয়।

কেনইবা আল্লাহর ওলীরা বিতর্ককে ঘৃণা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই তো বলেছেন, বিতর্কে জড়ানো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলে বিতর্ক ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

দ্বীন কিভাবে শিখবে ও শেখাবে?

"সন্তানের ব্যাপারে উদাসীনতা আমাদের সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিশেষ-বিশেষ পরিবেশেও এ উদাসীনতা দেখা যায়। নিজে দ্বীনদার হলেও সন্তানকে দ্বীন শেখানোর ফিকির নেই। এমনকি কুরআন ও নামায শিক্ষা থেকেও সন্তানকে বঞ্চিত রাখে। সন্তানকে জাগতিক শিক্ষায় উচ্চতর করে তোলে; অথচ দ্বীনের ব্যাপারে তাকে রাখে একেবারে অজ্ঞ ও মূর্খ।"

দ্বীন কিভাবে শিখবে ও শিখাবে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُم ، صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ – (صحيح بخارى ، كتاب الاذان ، باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

মালিক ইবনে হুয়াইরিছ রাযি। সাহাবী, বনুলাইছ গোত্রের সদস্য ছিলেন। মদীনা থেকে অনেক দূরে ছিলো তার গোত্রের অবস্থান। আল্লাহ তাদেরকে ঈমান গ্রহণের তাওফীক দিয়েছিলেন। সকলেই মুসলমান হলেন। নিজেদের গ্রাম থেকে তারা মদীনাতে পৌঁছলেন। সকলেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। সাহাবী মালিক রাযি আলোচ্য হাদীসে সেই ঘটনারই বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মদীনায়। সবাই ছিলাম তারুণ্যের তপ্ত বয়সে উপনীত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে আমরা বিশদিন ছিলাম। বিশদিন পর তিনি ভাবলেন, হয়ত বাড়িতে ফেরার আগ্রহ আমাদের অন্তরে জেগেছে। তাই তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে তোমাদের কারা আছে? আমরা বললাম, অমুক-অমুক পরিজন আছে। তিনি তো ছিলেন মানবতার নবী। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। আপন হৃদয়ে সকলের জন্য তিনি কোমলতা পুষতেন। তাই তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের বাড়িতে চলে যাও। তাদেরকে দ্বীন শেখাও। দ্বীনের উপর আমল করার কথা তাদেরকে বলো। যেভাবে তোমরা আমাকে নামায পড়তে দেখেছো, সেভাবেই তোমরা নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে একজন গিয়ে আযান দেবে। তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় তাকে ইমামতি করতে বলবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এদেরকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

দ্বীন শেখার পদ্ধতি

হাদীসটি সুদীর্ঘ। যাতে রয়েছে আমাদের জন্য বহুবিধ শিক্ষা। মালিক ইবনে হুয়াইরিছ (রা.)-কে প্রথম যে কথাটি বলেছেন, তাহলো, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে যখন এসেছি, তখন সবাই ছিলাম সমবয়সী ও তরুণ, সেখানে আমরা বিশদিন অবস্থান করেছি। মূলত এটাই দ্বীন শেখার পদ্ধতি। ওই যুগে নিয়মতান্ত্রিক কোনো মাদরাসা ছিলোনা, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিও ছিলোনা কিংবা কোনো কিতাবও ছিল না। তাই দ্বীন শেখার একটাই তরিকা ছিলো। তাহলো, যে ব্যক্তি দ্বীন শিখতে চাইতেন, সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোহবতে চলে আসতেন। এখানে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখতেন যে, তিনি জীবনযাপন করেন কিভাবে? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কর্মসূচী কী? লোকজনের সাথে তিনি কেমন আচরণ করেন? ঘরোয়া জীবন তিনি কিভাবে কাটান? বাইরের লোকজনের সাথে চলাফেরা তিনি কিভাবে করেন? এসব বিষয়গুলো তাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, এভাবেই তাঁরা দ্বীন শিখেছেন।

সোহবতের পরিচয়

'সোহবত' দ্বীন শেখার মৌলিক ধারা। এর কারণ হলো, বই ও বিদ্যালয় থেকে দ্বীন তারা শিখতে পারে, যারা পড়ালেখা জানে। তাছাড়া শুধু বই-কিতাব দ্বারা পরিপূর্ণ দ্বীন শেখা সম্ভবও নয়। আল্লাহ তা'আলা মানবস্বভাবে এ বিষয়টি দিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ শুধু বই পড়ে কোনো বিদ্যা অর্জন করতে পারে না। জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা।

চিকিৎসক হতে হলে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থাকতে হয়। ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে সময় দিতে হয়। এমনকি পাচক হতে চাইলে একজন অভিজ্ঞ বাবুর্চির কাছে সময় কাটাতে হয়। এরই নাম সোহবত। অর্থাৎ বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ যারা তাদের সংস্পর্শে থাকা।

সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে দ্বীন শিখেছেন এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানী কিতাবের সাথে রাসূলও পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষের কাছে নবী-রাসূল না পাঠিয়ে সরাসরি কিতাব পাঠাতে পারতেন। এমনটি কেন করেননি? বরং তিনি কিতাবের সাথে রাসূলও পাঠিয়েছেন। যেন রাসূল ওই কিতাবের উপর আ'মল করে মানুষকে সরাসরি কিতাবের উপর কিভাবে আ'মল করতে হবে তা বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর এভাবে মানবজাতি যেন ওই রাসূলের সংস্পর্শে থেকে আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার তরিকা জানতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করুন। তারা কোন ভার্সিটির ছাত্র ছিলেন? কোন মাদরাসা থেকে তাঁরা ফারেগ হয়েছিলেন? কোন কিতাবগুলো তাঁরা পড়েছিলেন? সত্য কথা হলো, তাদের জন্য বাহ্যিক কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলোনা, নির্দিষ্ট কোনো কোর্স-সিলেবাস ছিলোনা, কিতাব ও বইপত্রও ছিলো না। কিন্তু একজন সাহাবীর আমলী জীবনের সামনে হাজারো প্রতিষ্ঠান কিছুই নয়। কেননা, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। প্রতিটি আমল সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা ওই আমলটি নিজের জীবনে বাস্তবায়ান করার পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন। এভাবেই তাঁরা সাহাবী হয়েছিলেন।

ভালো সোহবত গ্রহণ কর

সোহবত মানুষকে অনেক দামী বানাতে পারে। তাই এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবে তুমি কার সোহবত গ্রহণ করছো। দ্বীন শিখতে হলে সোহবতকে সহীহ করতে হবে অবশ্যই। এমন লোকের কাছে যেতে হবে, এমন লোকের সাথে চলাফেরা

করতে হবে, যিনি প্রকৃতপক্ষেই দ্বীনের ধারক-বাহক। এতে দ্বীনের উপর আমল করার যোগ্যতা তৈরি হবে। দ্বীনের প্রতি আযমত ও মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে সোহবত যদি হয় ভ্রান্তলোকের, তাহলে সে তোমাকেও ভ্রান্ত করে ছাড়বে। এ দ্বীন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানা থেকে এভাবেই চলে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোহবতে সাহাবায়ে কেরাম তৈরি হয়েছেন, সাহাবাদের সোহবতে তাবিঈগণ তৈরি হয়েছে। তাবিঈগণের সোহবতে তৈরি হয়েছেন তাবে-তাবিঈনের জামাত। এ ধারাবাহিকতাই দ্বীন আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে।

দুটি সিলসিলা

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দুটি সিলসিলা দান করেছেন। (১) কিতাবুল্লাহর সিলসিলা (২) রিজালুল্লাহর সিলসিলা। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর পাশাপাশি এমন সব মনীষীও আল্লাহ প্রেরণ করেছেন, যারা কিতাবুল্লাহর উপর আমল করে দেখিয়েছেন। সুতরাং দ্বীন চলবে এ দুই ধারার মাধ্যমেই। এছাড়া দ্বীন চলবে না। দ্বীনের হাকীকত এ দুই ধারা ছাড়া বোঝা অসম্ভব। সুতরাং কেউ যদি রিজালুল্লাহকে উপেক্ষা করে শুধু কিতাবুল্লাহ নিয়েই মেতে থাকে, তাহলে সে যেমনিভাবে পথহারা হতে বাধ্য, অনুরূপভাবে যে কিতাবুল্লাহ উপেক্ষা করে শুধু রিজালুল্লাহকে সবকিছু মনে করে তারাও পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

এইজন্যই আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, এ সময়ে দ্বীন শেখার ও দ্বীনের উপর আমল করার সহজ উপায় হলো, আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শ নিতে হবে। এমন লোকের সোহবত গ্রহণ করতে হবে, যারা দ্বীন বোঝেন এবং নিজেও দ্বীনের উপর আমল করেন। যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর আমল করেন। যে ব্যক্তি যত বেশি সোহবত নিতে পারবে, সে দ্বীনের ব্যাপারে তত বেশি উন্নতি সাধন করতে পারবে।

যাই হোক, আলোচ্য হাদীসে এমন কিছু সাহাবায়ে কেরামের বিবরণ এসেছে, যাঁরা দূরের বাসিন্দা হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোহবতে নিয়মিত থাকতে পারতেন না। তাই তাঁরা এ সোহবত লাভের জন্য বিশদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে অবস্থান করলেন। এ বিশদিনে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শিখে নিলেন।

ছোটদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মনে হলো, এরা তো যুবক; নিজেদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসেছে। সুতরাং এদের অন্তরে বাড়ি-ঘরের চিন্তা হয়ত আনাগোনা

ঘরওয়লাদেরকেও কমপক্ষে এতটুকু দ্বীন শেখাতে হবে, যাতে তারা মুসলমানী জিন্দেগী যাপন করতে পারে। যেমন– নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের ইল্‌ম তাদেরকে শেখাতে হবে।

সন্তানের ব্যাপারে উদাসীনতা

সন্তানের ব্যাপারে উদাসীনতা আমাদের সমাজে ব্যাপক। বিশেষ-বিশেষ পরিবেশেও এ উদাসীনতা দেখা যায়। নিজে খুব দ্বীনদার; অথচ সন্তানকে দ্বীন শেখানোর ফিকির করেনা। এমনকি কুরআন মজীদ ও নামায শিক্ষা থেকেও সন্তানকে বঞ্চিত রাখে। সন্তানকে জাগতিক শিক্ষায় উচ্চতর করে তোলে আর দ্বীনের ব্যাপারে তাকে মূর্খ রাখে। এজন্যই বলি, সন্তানদেরকে দ্বীন শেখাতে হবে। কমপক্ষে যতটুকু ইল্‌ম একজন মুসলমানের জীবনে প্রয়োজন হয়, ততটুকু শেখাতে হবে।

নামায পড়বে কিভাবে?

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَ يْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

বাড়ি-ঘরে গিয়ে তোমরা নামায পড়বে আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ। দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু নামায পড়ার কথা বলেননি। বরং নামায তাঁর সুন্নাত মোতাবেক পড়ার জন্য বলেছেন। কেননা, নামায এ দ্বীনের একটি বুনিয়াদ। সুতরাং মাথা থেকে বোঝা ফেললাম টাইপের নামায যেন না হয়। বরং কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা ও বৈঠকসহ সব যেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত মোতাবেক হয়। বর্তমানে এ বিষয়টির প্রতিও খুব গুরুত্ব দেয়ার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

নামায সুন্নাত মোতাবেক পড়ুন

সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রেখে নামায পড়লে সময় যতটুকু যাবে এবং কষ্ট যতটুকু হবে, ততটুকু সময় ও কষ্ট উদাসীনতার সাথে নামায পড়লেও যাবে। তবে পার্থক্য হলো, সুন্নাত মোতাবেক নামায পড়লে সুন্নাতের নূর ও বরকত পাওয়া যাবে। আর পক্ষান্তরে সুন্নাতমুক্ত নামাযে এ নূর ও বরকত পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, নামায আদায় হয়ে যাবে, তবে তা নূর ও বরকতমুক্ত নামায হবে।

নামায দুরস্ত করার প্রতি মুফতীয়ে আ'যম (রহ.) এর গুরুত্ব

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) তিরাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। শিশুকাল থেকেই দ্বীনি পরিবেশে ছিলেন। সারাজীবন দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন, ফতওয়া লিখেছেন, এমনকি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আ'যম (প্রধান মুফতী)ও হয়েছেন। লাখেরও অধিক ফতওয়া তিনি মৌখিক ও লিখিত আকারে দিয়েছেন। একবার তিনি বলেন, আমার জীবনটা ফিক্হ শাস্ত্রের পেছনে কেটেছে। কিন্তু নামায পড়াকালে এখনও আমি এ সন্দেহের মাঝে পড়ে যাই যে, এখন কী করবো। তারপর নামায শেষে আমাকে কিতাব দেখতে হয় যে, আমার নামায ঠিক হলো কিনা? অথচ অনেক লোককে আমি দেখি যে, তার নামায শুদ্ধ হলো কিনা এ ব্যাপারে কোনোই লক্ষ্য নেই। নামায সুন্নাত মোতাবেক হলো কিনা–এ চিন্তা করার কথা তো তারা ভাবেই না।

নামায ফাসেদ হয়ে যাবে

নামাযের কাতারে সব সময় দেখা যায়, মানুষ নামায পড়ছে আর হাত এদিক-সেদিক নাড়াচাড়া করছে। কেউবা চেহারায় হাত বুলাচ্ছে কেউবা কাপড় নিয়ে খেলা করছে। মনে রাখবেন, এভাবে যদি তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় কেটে যায় অর্থাৎ এত পরিমাণ সময়, যাতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلٰى বলা যায়, তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তার নামাযের ফরযই অনাদায়ী থেকে যাবে। অনুরূপভাবে নামাযে যদি এমন কাজ করা হয়, যাতে কারো মনে সংশয় দেখা দিতে পারে যে, এ ব্যক্তি নামায পড়ছে কিনা, তাহলে তার নামায ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে অনেকে সিজদা দেয়, তবে পা দুটি মাটি থেকে আলাদা করে রাখে। অথচ পুরো সিজদাতে যদি মাটিতে পা একবারও না লাগে, তাহলে তার নামায হবে না। এসবই আমাদের সমাজের মুসল্লিরা বেপরোয়াভাবে করে।

শুধু নিয়ত শুদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়

এ কয়েকটি কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করলাম। এ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। নামায পড়লাম, অথচ সহীহ হলো না। তাহলে সব মেহনতই তো গোল্লায় গেলো। বর্তমানে তো এসব কথা বললেও দোষ। তখন অনেকে রেডিমেট উত্তর দিয়ে দেয় যে, ভাই হাদীস শরীফে এসেছে, اِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর আমাদের নিয়ত তো ঠিক আছে। মনে রাখবেন, শুধু নিয়ত যথেষ্ট নয়। যদি শুধু

নিয়ত যথেষ্ট হতো, তাহলে ঘরে বসে মনে-মনে নামায পড়ে নিলেই তো হতো। আপনি নিয়ত করেছেন লাহোর যাবেন; কিন্তু উঠে বসেছেন কোয়েটার ট্রেনে, তাহলে লাহোর কি যেতে পারবেন? পারবেন না। সুতরাং বোঝা গেলো শুধু নিয়ত যথেষ্ট নয়; বরং নিয়তের পাশাপাশি আমলও জরুরি। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরিকার নামই তো হলো আমল। সুতরাং নামায পড়তে হবে সেভাবে যেভাবে, রাসূলুল্লাহ (সা.) পড়েছেন।

আযানের গুরুত্ব

আলোচ্য হাদীসে তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ -

অর্থাৎ– যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দিবে।

আযান দেয়া সুন্নাত। মনে করুন কেউ যদি মসজিদে নামায না পড়ে কোনো কারণে ময়দানে বা বনে নামায পড়ে, তখনও আযান দেয়া সুন্নাত। এমনকি একাকী নামাযের সময়ও আযান সুন্নাত। কেননা, আযান আল্লাহর দ্বীনের একটি প্রতীক ও আলামত। কোনো-কোনো আলেমের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, ময়দানে বা জঙ্গলে আযান দেয়ার মাঝে কী হেকমত? কিংবা যেখানে শোনার কেউ নেই সেখানে। যেমন– অমুসলিম দেশে আযান কেন দেয়া হয়? আলেমরা এর উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহর সৃষ্টি অগণিত। তোমার আযান মানুষ হয়ত শোনে না, তবে হতে পারে ফেরেশতা কিংবা জ্বিনরা তোমার আযান শুনবে এবং তোমার সাথে নামাযে শরিক হবে।

সারকথা হলো, নামাযের পূর্বে আযান দেয়া সুন্নাত। এমনকি একাকী হলেও।

বড়কে ইমাম বানাবে

তারপর তিনি বলেন, وَلْيَؤُمُّكُمْ اَكْبَرُكُمْ অর্থাৎ– তোমাদের মধ্য থেকে যিনি বয়সের দিক থেকে বড় হবেন, তিনি ইমামতি করবেন। মূল বিধান হলো এরকম– জামাতের সময় যদি অনেক লোক থাকে, তাহলে যিনি এদের মধ্যে বড় আলেম ইমামতি করবেন তিনি। আর উক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু এরা সকলেই ইল্‌মের দিক থেকে সমান ছিলেন, সবাই দল বেঁধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে এসেছিলেন, সবাই একই ইল্‌ম তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তাই আল্লাহর রাসূল (সা.) এদেরকে উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন।

বড়কে সম্মান করা

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার ইহুদীদের জনপদ খায়বরে ইহুদীরা এক মুসলমানকে শহিদ করে দিয়েছিলো। যিনি নিহত হয়েছিলেন, তার এক ভাই ছিলো। যে ভাই নিহত মুসলমানের অভিভাবক ছিলো, উত্তরাধিকারীও ছিলো, সে ভাই নিজের চাচাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে এটা বলার জন্য আসলো যে, আমাদের ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। এখন এর প্রতিশোধ নেবো কিভাবে? এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আসার পর সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তির ভাই কথা শুরু করলো, চাচা চুপ ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ভাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন– كَبِّرِ الْكُبْرَ বড়কে বড়'র মর্যাদা দাও। অর্থাৎ– তোমার চাচা উপস্থিত থাকাকালীন তুমি কথা বলোনা। কেননা, এটা শিষ্টাচার নয়। সুতরাং তিনিই আগে বলুক। প্রয়োজন হলে তুমি মাঝখানে বলতে পারবে। বোঝা গেলো, বড়কে সম্মান দিতে হয়। তাই আলোচ্য হাদীসেও এসব সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ বললেন, যিনি বয়সে বড় হবেন, তাকে তোমরা ইমামতি করতে দেবে।

আল্লাহ আমাদেরকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

ইসতেখারার সুন্নাত পদ্ধতি

"ইসতেখারা করার পর নিশ্চিত হয়ে যাও। ধরে নাও, আল্লাহ তোমার জন্য উত্তম ফয়সালা করবেন। যে ফয়সালা ক্ষেত্রবিশেষে দৃশ্যত তোমার কাছে ভালো মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে ভালো। তারপর এ 'ভালো'টাও হয়ত দুনিয়াতে তুমি টের পাবেনা; বরং আখেরাতে উপভোগ করবে।"

ইস্‌তেখারার সুন্নাত পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ مَكْحُوْلِ الْاَزْدِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ : سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : اِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَخِيْرُ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَخْتَارُ لَهٗ فَيَسْخُطُ عَلٰى رَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ ، فَلَا يَلْبُثُ اَنْ يَّنْظُرَ فِى الْعَاقِبَةِ فَاِذَاهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ – (كتاب الزهد لابن مبارك ، زيادات الزهد لنعيم بن حماد ، باب فى الرضا بالقضاء صفحه ٣٢)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হাদীসের মর্ম

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর একটি বাণী এটি। তিনি বলেন, অনেক সময় মানুষ আল্লাহর কাছে ইস্‌তেখারা করা অর্থাৎ যে কাজটিতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে, তা যেন হয় আল্লাহর দরবারে সে এ কামনা করে, তখন আল্লাহ ওই কাজটি তাকে করার সুযোগ করে দেন, যা তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে বান্দা কাজটি নিয়ে ব্যথিত হয়। মনের

বিপরীত কাজ পেয়ে সে বলে, আমি আল্লাহর কাছে কামনা করেছি আমার জন্য যা ভালো হয় তা, অথচ পেলাম এ কাজ, এখন একাজে তো দেখি শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। তারপর কিছুদিন যাওয়ার পরই বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট হয়। তখন সে টের পায়, মূলত আল্লাহ আমার জন্য যা ফয়সালা করেছেন, তাতেই মঙ্গল ও কল্যাণ। অর্থাৎ– তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে না এলেও বিষয়টি সে পরে বুঝতে পারে। তাছাড়া কোন কাজে কল্যাণ আছে আর কোন কাজে কল্যাণ নেই, তা অনেক সময় দুনিয়াতে বোঝা যায় না, বরং আখেরাতে তা প্রকাশ পাবে।

এ বর্ণনায় কয়েকটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলো বুঝে নেয়া প্রয়োজন। প্রথম কথা হলো, বান্দা যখন আল্লাহর কাছে ইস্‌তেখারা করে, আল্লাহ তখন কল্যাণের ফয়সালা করেন। ইস্‌তেখারা কাকে বলা হয়? এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত মনে করা হয়, ইস্‌তেখারার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও আমল। তারপর রয়েছে স্বপ্ন দেখা। স্বপ্নের ভেতর এ দিকনির্দেশনা দেয়া হয় যে অমুক কাজটি কর। মনে রাখবেন, ইস্‌তেখারার যে মাসনূন পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণিত, সেখানে এ ধরনের কোনো কথা নেই।

ইস্‌তেখারার পদ্ধতি এবং দু'আ

ইস্‌তেখারার মাসনূন পদ্ধতি এই– দুই রাকাত নফল নামায ইসতেখারার নিয়তে পড়বে। নিয়ত করবে এভাবে, আমার সামনে পথ আছে দুটি। এর মধ্য থেকে যেটি আমার জন্য মঙ্গলজনক আল্লাহ যেন আমার জন্য তার সিদ্ধান্ত দান করেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়বে। নামাযের পর ইস্‌তেখারার মাসনূন দু'আ পড়বে, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। দু'আটি খুব বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবীরাই পারেন এমন অন্তপ্রাণসম্পন্ন দু'আ করতে ও শেখাতে। আর কারো পক্ষে এমন দু'আ রচনা করা সম্ভব নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেললেও নয়। দু'আটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌلِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعِیْشَتِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ أَوْقَالَ فِیْ عَاجِلِ أَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ

بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَ الْاَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْقَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِه فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ —

(ترمذی ، کتاب الصلاۃ ، باب ماجاء فی صلاۃ الاستخارۃ)

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আপনার ইল্‌মের উসিলায় আপনারই কাছে কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের উসিলায় আমি আপনারই কাছে ভালো কাজ করার তাওফীক কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা, আপনি সব পারেন, আমি পারিনা। আপনি সব জানেন, আমি জানিনা। আপনি গায়েবের বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! বিষয়টি যদি আমার ধর্ম, জীবনপ্রবাহ ও পরিণামের দিক থেকে আমার জন্য মঙ্গলজনক মনে করেন, (এখানে ওই বিষয়টি মনে-মনে ভাববে যার জন্য ইস্‌তেখারা করা হচ্ছে) তাহলে বিষয়টি আমার জন্য সহজ করে দিন তারপর এতে বরকত দান করুন। আর যদি আপনি মনে করেন যে, বিষয়টি আমার জন্য, আমার ধর্ম, জীবনপ্রবাহ ও পরিণামের দিক থেকে অকল্যাণকর, তাহলে আমার থেকে ফিরিয়ে নিন এবং আমাকেও এ থেকে ফিরিয়ে আনুন। আর আমার জন্য যেখানেই হোক কল্যাণের ফয়সালা করুন। তারপর তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন। দুই রাকাত নফল পড়ার পর এ দু'আটি করবে–এতেই ইস্‌তেখারা হয়ে যাবে।

ইস্‌তেখারার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই

অনেকে মনে করেন, ইস্‌তেখারা করতে হয় ইশার নামাযের পর কিংবা রাতের বেলা শোয়ার পূর্বে। মূলত এমনটি জরুরি নয়। বরং যখনই সুযোগ হয়, তখনই ইস্‌তেখারা করা যাবে। রাত-দিন কিংবা ঘুম ও জাগ্রত থাকার কোনো শর্ত এখানে নেই।

স্বপ্ন দেখা জরুরি নয়

অনেকে মনে করেন, ইস্‌তেখারার পর স্বপ্ন দেখা দিবে। স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, অমুক কাজটি করো কিংবা করোনা। মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখাও জরুরি নয়। বরং অনেক সময় স্বপ্ন দেখা দেয় আর অনেক সময় দেখা দেয় না।

ইস্তেখারার ফল

কেউ-কেউ বলেন, ইস্তেখারার পর অন্তর একদিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এমনটি হয়েও থাকে। তখন মন যে দিকে ঝুঁকবে সেটাই করবে। কিন্তু ধরুন, কারো যদি এমন অবস্থাও সৃষ্টি না হয়; বরং ইস্তেখারার পরেও মন দোদুল্যমান থাকে। মনে রাখবেন, তখনও ইসতেখারার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, ইস্তেখারা করার পর আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য সেটাই ফয়সালা করেন, যা তার জন্য কল্যাণকর। তারপর অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটে, যা বান্দার জন্য মঙ্গলজনক। অনেক সময় মানুষ কোনো বিষয়কে খুব কল্যাণকর মনে করে; কিন্তু হঠাৎ একটি বাধা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। আল্লাহ বান্দাকে ওই কাজ আর করতে দেননা। এর অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে এটা তার জন্য কল্যাণকর ছিলোনা। কল্যাণ কিসের মধ্যে, এটা তো আল্লাহই ভালো জানেন। তাই ইস্তেখারার বরকতে তাকে এমন কাজ করার তাওফীক দেন, যা তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু অনেক সময় বিষয়টি বান্দার কাছে অবোধগম্য থেকে যায়।

তোমার জন্য এটাই ভালো ছিলো

যেহেতু বিষয়টি বান্দা বুঝে উঠতে পারে না, তাই অনেক সময় সে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহ, আমি চাইলাম কী আর আপনি করলেন কী! এইজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, হে মূর্খ! তুমি নিজের সীমিত বুদ্ধি নিয়ে ভাবছো কাজটি তোমার জন্য মঙ্গলজনক হয়নি। কিন্তু যার ইল্‌মে রয়েছে গোটা বিশ্বজগতের সবকিছু, প্রকৃতপক্ষে তিনিই তো জানেন তোমার জন্য কোনটি মঙ্গলজনক।

তিনি যা করেছেন, সেটাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক। অনেক সময় মানুষের কাছে বিষয়টি পুরো জীবনের জন্য অবোধগম্য থেকে যায়। তারপর পরকালে গিয়েই পরিষ্কার হবে কোন বিষয়টি তার জন্য ভালো ছিলো।

শিশুর মতো তুমি

যেমন একটি শিশু। মা-বাবার কাছে বাহানা ধরেছে সে অমুক জিনিস খাবে। মা-বাবা জানে, জিনিসটি খেলে তার ক্ষতি হবে। তাই তারা জিনিসটি তাকে দিচ্ছেনা। এখন শিশুটি নিজের মূর্খতার কারণে মনে করছে, মা-বাবা আমার উপর যুলুম করছে। আমি যা চাই তা দিচ্ছেনা। বরং উল্টো তিতা ঔষধ খাওয়াচ্ছে। শিশুটি তিতা ঔষধের উপকারিতা জানে না। তাই ভাবছে, এটা আমার জন্য কল্যাণকর নয়।

কিন্তু একদিন সে বড় হবে। তখন সে বুঝবে, আমি তো আমার জন্য বিষ চেয়েছিলাম। আর মা-বাবা আমার সুস্থতার কথা ভেবেছিলেন। সুতরাং মা-বাবার কাজটাই ছিলো সঠিক আর আমারটা ছিলো বেঠিক। আল্লাহ তা'আলা তো নিজ বান্দার উপর মা-বাবার চেয়ে দয়ালু। তাই তিনি বান্দার জন্য সেটাই ফয়সালা করেন, যা বান্দর জন্য প্রয়োজন মঙ্গলজনক। কিন্তু বান্দা হয়ত বিষয়টি বোঝেনা। বুঝলেও পরে বোঝে।

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা

ঘটনাটি শুনেছি আমার শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর মুখে। ঘটনাটি এই- হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক লোকের সাথে তাঁর দেখা হয়। লোকটি বললো, মূসা! আপনি তো আল্লার কাছে যাচ্ছেন। নিজের প্রয়োজনের কথা বলার মোক্ষম সময় তো এটাই হয়। আমি একজন গরীব মানুষ। উপরন্তু নানা মুসিবতে জর্জরিত। আপনি যখন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন, তখন দয়া করে আমার কথাও বলবেন। আল্লাহর দরবারে আমার সুখ-শান্তির জন্য একটু দু'আ করবেন।

হযরত মূসা লোকটিকে ওয়াদা দিলেন। বললেন, ঠিক আছে, তোমার জন্য দু'আ করবো।

তারপর মূসা (আ.) চলে গেলেন তূর পাহাড়ে। আল্লাহর সাথে কথা বললেন, কথাশেষে লোকটির কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লো। তাই আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! অমুক জায়গায় আপনার এক বান্দা আছে। তার নাম এই। সে আমাকে বলেছিলো, আমি যখন আপনার সামনে আসবো, তখন তার দুরাবস্থার কথা যেন আপনাকে জানাই। হে আল্লাহ! সেও তো আপনার বান্দা। আপনি তার উপর একটু দয়া করুন। সে যেন সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে এর ব্যবস্থা করে দিন। তাকে আপনার নেয়ামত দান করুন এবং তার মুসিবত দূর করে দিন। আল্লাহ বলেন, মূসা! তাকে অল্প নেয়ামত দেবো, না বেশি নেয়ামত দেবো? মূসা (আ.) ভাবলেন, আল্লাহর কাছে চাচ্ছি সুতরাং কম চাইবো কেন? তাই তিনি বললেন, হে আল্লাহ নেয়ামত যেহেতু দেবেন তো বেশি করে দিন। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে যাও। আমি তাকে অনেক নেয়ামত দিয়ে দিলাম। আল্লাহর কথা শুনে হযরত মূসা (আ.) খুব খুশি হলেন। তারপর যে কদিন তূর পাহাড়ের থাকার ছিলো, সে কয়দিন সেখানে থাকলেন।

কয়েকদিন পর যখন তিনি তূর পাহাড় থেকে ফিরে এলেন, তখন তার অন্তরে জাগলো, যে বান্দর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলাম, তার একটু

খোঁজ নেয়া দরকার। তাই তিনি লোকটির বাড়িতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন লোকটি নেই। লোকটির বাড়িতে এখন অন্য লোক। মূসা (আ.) বললেন, আমি অমুকের সাথে দেখা করতে চাই। তখন মূসা (আ.) কে জানানো হলো, ওই লোক তো ইন্তেকাল করেছেন। মূসা (আ.) হিসাব করে দেখলেন, যে সময় তিনি লোকটির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন এর কিছুক্ষণ পরেই লোকটি ইন্তেকাল করেছে। এতে মূসা (আ.) খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ! ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমি দু'আ করলাম তার সুখ-শান্তির; অথচ আপনি তাকে মেরেই ফেললেন। আল্লাহ উত্তর দিলেন, মূসা! তুমি যখন আমার কাছে লোকটির জন্য দু'আ করেছিলে, তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী পরিমাণ নেয়ামত দেবো- বেশি না কম? তুমি বলেছিলে- বেশি। আর যদি আমি সারা দুনিয়াও দান করতাম, তাহলে তা বেশি হতো না বরং কমই হতো। তাই বেশি নেয়ামত দেয়ার জন্য তাকে জান্নাতে নিয়ে এলাম।

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেলো, মানুষ সীমিত বুদ্ধি দ্বারা নিজের কল্যাণ নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই ভালো জানেন কার কল্যাণ কীসে।

ইস্তেখারা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে যাও

এ কারণেই আলোচ্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, ইসতেখারা করার পর নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। ভাবো, আল্লাহ আমার জন্য উত্তম ফয়সালা করবেন। সে ফয়সালা ক্ষেত্রবিশেষ দৃশ্যত ভালো মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে ভালো। তারপর 'ভালো' হওয়াটাও হয়তো দুনিয়াতে প্রকাশ নাও পেতে পারে বরং আখেরাতে প্রকাশ পাবে।

ইস্তেখারাকারী ব্যর্থ হয় না

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَاخَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلاَ نَدِمَ مَنْ اِسْتَشَارَ - (مجمع الزوائد ، ج ٨ ص ٩٦)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসতেখারা করে, সে ব্যর্থ হয় না আর যে পরামর্শ করে, সে লজ্জিত হয় না।

ইস্তেখারারার সংক্ষিপ্ত দু'আ

ইস্তেখারার উল্লিখিত পদ্ধতি কিছুটা দীর্ঘ। অনেক সময় মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এত দীর্ঘ সময় নাও পেতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ একটি সংক্ষিপ্ত দু'আ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। দু'আটি এই-

اَللّٰهُمَّ خِرْلِىْ وَاخْتَرْلِىْ

হে আল্লাহ! আপনিই ঠিক করে দিন আমাকে কোনটি অবলম্বন করতে হবে।' (কানযুল উম্মাল খ.৭, হাদীস নং-১৮০৫৩)

এছাড়া আরেকটি দু'আ হাদীস শরীফে রয়েছে। তাহলো–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَاسَدِدْنِىْ

'হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখান এবং সোজা পথ দেখান।'

(সহীহ মুসলিম-যিকর ও দু'আ অধ্যায়)

অনুরূপভাবে এ দু'আটিও হাদীস শরীফে এসেছে–

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ

'হে আল্লাহ যে পথটি সঠিক, তা আমার অন্তরে ঢেলে দিন।'

(তিরমিযী, কিতাবুদদাওয়াত, অধ্যায় নং : ৭০)

যদি আরবীতে সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে নিজের ভাষায় এ দু'আগুলো করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যদি মুখে উচ্চারণ সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে মনে-মনে হলেও এ দু'আগুলো করুন।

মুফতী শফী (রহ.)-এর আমল

আমি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) কে সারা জীবন এ আমল করতে দেখেছি। যখন এমন কোনো বিষয় তাঁর সামনে আসতো, যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া মুশকিল হয়ে যেতো, তখন তিনি ক্ষণিকের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলতেন। যারা তাঁর এ আমলের রহস্য জানতো না, তারা বিষয়টি বুঝতো না। কিন্তু মূলত তিনি চোখ বন্ধ করে দিলকে আল্লাহমুখী করে নিতেন এবং মনে-মনে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমার সামনে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। সিদ্ধান্ত ও সমাধানের ব্যাপারে আমি দোদুল্যমান। আপনি দয়া করে আমার অন্তরে তা-ই ঢেলে দিন, যা আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য উত্তম।

এভাবে তিনি মনে মনেই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণিকের ইসতেখারা করে নিতেন।

প্রত্যেক কাজের শুরুতে আল্লাহমুখী হওয়া

আমার শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক কাজের শুরুতে আল্লাহমুখী হবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। কেননা, তুমি হয়ত জানো না যে, তুমি ক্ষণিকের মধ্যে কী করে ফেলেছ। অর্থাৎ– ক্ষণিকের মধ্যে তুমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছ। আল্লাহর কাছে কল্যাণ

কামনা সঠিক পথের সন্ধান নিয়ে নিয়েছ। তোমার এ ক্ষণিকের আমল দুটি সাওয়াবের যোগ্য হলো। প্রথমত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার সাওয়াব। দ্বিতীয়ত, দু'আর সাওয়াব। এজন্যই আমলটি ক্ষণিকের হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তাই সব সময় মানুষের এ আমলটি করা উচিত।

উত্তর দানের সময় দু'আর আমল

হাকীমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন, একটা আমল আমি সব সময় করি। তাহলো, কেউ আমার কাছে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য এলে আমি সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হই। কারণ, আমি তো জানি না সে আমাকে কী জিজ্ঞেস করবে। তাই দু'আ করতে থাকি, হে আল্লাহ! এ লোক আমাকে যা জিজ্ঞেস করবে, তার সঠিক উত্তর আমার অন্তরে ঢেলে দিন। মূলত একেই বলা হয় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, ভাই! নিজের রবের সাথে কথা বলো। যে কোনো ঘটনার মাঝে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আল্লার দিকে রুজু' হও। ওই কাজে আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত ও নির্দেশনা তলব কর। এ অভ্যাস নিজের জীবনের জন্য অনিবার্য করে নাও। এতে ধীরে-ধীরে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় হবে। ফলে একসময় অন্তরে শুধু আল্লাহর কথাই জাগরুক থাকবে।

তিনি আরো বলতেন, আগেকার বুযুর্গানেদ্বীন যে পরিমাণে রিয়াযত-মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনা করেছেন, তোমরা তা কোত্থেকে পারবে। এজন্য আমি তোমাদের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ কার্যকর প্রক্রিয়া বলে দিচ্ছি। এতে 'ইনশাআল্লাহ' আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। আসল উদ্দেশ্য তো হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। আর তা ইনশাআল্লাহ উক্ত পদ্ধতিতে লাভ করা সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

উপকারের বিনিময়ে উপকার

"উপকারের বিনিময়ে উপকার করবে। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনটি করতেন তাই তাঁর সুন্নাতের অনুসরণে তুমিও করবে। হাদিয়া গ্রহণের সময় একে ঋণ মনে করবে না এবং নিজেও বিনিময় পাওয়ার আশায় হাদিয়া দিবেনা। বরং নিয়ত থাকতে হবে, সুন্নাত পালনের মাধ্যমে এক মুসলমানের অন্তর জয় করা এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।"

উপকারের বিনিময়ে উপকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْه، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِه وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّٰه رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْطٰى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِ بِه وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ — فَانَّ مَنْ اَثْنىٰ فَقَدْ شَكَرَ ، مَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلّٰى بِمَالَمْ يُعْطِه كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ – (ترمذى ، كتاب البروا الصلة، باب ماجاء فى المتشبع بما لم يعطه)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কাউকে কিছু হাদিয়া দেয়া হলে সে যদি সঙ্গতি পায়, তবে যেন এর বদলা দিয়ে দেয়। আর যদি সঙ্গতি না পায়, তবে যেন সে তার প্রশংসা করে। কেননা, যে ব্যক্তি প্রশংসা করলো সে শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে তা গোপন রাখলো, সে নাশোকরী করলো, যা দেওয়া হয়নি এমন বিষয় দেওয়া হয়েছে বলে যে প্রকাশ করে, সে মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধানকারীর মতো। (তিরমিযী)

ভালো কাজের বিনিময়

আল্লাহর রাসূল (সা.) হাদীসটির মাধ্যমে দুটি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমত, কেউ যদি কারো সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে উপকৃত ব্যক্তির কর্তব্য হলো এর বিনিময় দিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, এ বিনিময়কে অপর এক হাদীসে 'মুকাফাত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। যার মর্মার্থ হলো, উপকারের বিনিময়ে উপকার, হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া। বিনিময় প্রদানের এই পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিলো, কোনো ব্যক্তি তাঁকে কিছু হাদিয়া দিলে তিনি এর বিনিময় দিতেন। কোনো ব্যক্তি তার উপকার করলে যে কোনোভাবে তিনিও ওই ব্যক্তির উপকার করতেন। সুতরাং এ ধরনের বিনিময় প্রদান সাওয়াবের কাজ।

বিনিময় লাভের আশায় হাদিয়া দেওয়া নাজায়েয

বর্তমান সমাজে বিনিময়ের একটা রীতি চালু আছে। তাহলো, মন চায়না কাউকে কিছু দিতে। তবুও দিতে হয় সমাজে নাক কাটা যাবে বলে। অথবা তবুও দেয় এ উদ্দেশ্যে যে, এখন আমি দিচ্ছি–পরবর্তী সময়ে আমার বাড়ীর অনুষ্ঠানে সেও আমাকে দিবে। কোনো কোনো এলাকাতে তো বিবাহ-শাদীতে কে কি দিয়েছে–রীতিমত তা তালিকা করে রাখা হয়। তারাও আশায় থাকেন যে, তিনি এই পরিমাণ গিফট আবার তার বাড়ীর অনুষ্ঠানের সময় অবশ্যই ফেরত পাবেন। এরপর যদি কম পান, তাহলে তাকে খোঁটা দেয়া হয়, তিরস্কার করা হয়। আর যদি মোটেই না পান, তাহলে তো আর কথাই নেই। ঝগড়া-বিবাদ ও হট্টগোলের পথ তখন আবিষ্কার হবেই। মনে রাখবেন, এ ধরনের বিনিময় অত্যন্ত খারাপ। পবিত্র কুরআনের সূরা রূমে একে সুদ বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

(سورة الروم ٣٩)

মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে–এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। –(সূরা রূম : ৩৯)

আলোচ্য আয়াতে এ ধরনের বিনিময়কে সুদ বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি কাউকে এ উদ্দেশ্যে বিনিময় দেয় যে, সে যেহেতু আমার বাড়ীর বিবাহ-অনুষ্ঠানে গিফট দিয়েছেন, এখন আমাকেও তার বাড়ীর অনুষ্ঠানে গিফট দিতেই হবে। অন্যথায় সমাজে আমার নাক কাটা যাবে। তাছাড়া লোকটির কাছেও আমি ঋণী হয়ে থাকবো। তাহলে এ বিনিময় প্রদান গুনাহ হয়ে যাবে। সুতরাং এসব প্রথায় নিজেকে কখনও জড়াবেন না। এ সবের মধ্যে না আছে কোনো পার্থিব উপকার আর না আছে কোনো পরকালীন উপকার।

মহব্বতের সঙ্গে হাদিয়া দাও

তবে যে বিনিময় প্রদানের শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা.) দিয়েছেন, তাহলো, বিনিময় প্রদানকারীর অন্তরে এ উদ্দেশ্য না থাকা যে, আমি যা দিচ্ছি, তার বিনিময় পাবো। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় একজন মুসলিম ভাই বা বোনের প্রতি নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা প্রকাশ। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার নেই। তাহলে এটা অবশ্যই বরকতপূর্ণ কাজ। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

تَهَادُوْا تَحَابُّو

'তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও, তাহলে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে।'

এ ধরনের নিঃস্বার্থ হাদিয়া দেওয়ার প্রতিই আল্লাহর রাসূল (সা.) তাগিদ দিয়েছেন। সুতরাং যিনি হাদিয়া দিবেন, তিনি বিনিময়ের কোনো আশা করতে পারবেন না। আর যিনি হাদিয়া পাবেন, তিনিও একথা মনে করতে পারবেন না যে, এর বিনিময় দিতে হবে। বরং মনে করবেন, আমার এক ভাই আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন, আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন, তাই আমারও মন চায় তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার। আমার সাধ্যমতে তাকে কিছু হাদিয়া দিয়ে খুশি করার ইচ্ছা তো আমারও আছে। তাহলে এরই নাম 'মুকাফাত' তথা হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া, উপকারের বিনিময়ে উপকার। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ।

বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান-সমানের প্রতি লক্ষ্য করোনা

'মুকাফাত' তথা হাদিয়া বিনিময়ে হাদিয়া–যার শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা.) দিয়েছেন। এর ফলে হাদিয়ার বিনিময় প্রদানকারীকে সমান-সমানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় না। বরং বিনিময় প্রদানকারী চিন্তা করবে এভাবে লোকটি তার সাধ্য

অনুপাতে আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। আমিও তার বিনিময় দেবো আমার সাধ্য অনুযায়ী। যেমন– কোনো ব্যক্তি আপনাকে মূল্যবান একটি বস্তু হাদিয়া দিলো, যে বস্তুটির বিনিময় দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন এর চেয়ে ছোট বা সাধারণ বস্তু বিনিময় হিসাবে দেয়ার সময় লজ্জাবোধ না থাকা উচিত। কেননা, হাদিয়া প্রদানকারীর উদ্দেশ্য ছিলো আপনার অন্তর খুশি করা। আর তাকে আপনি যে বিনিময় দিচ্ছেন– এরও উদ্দেশ্য হলো, আপনি তাকে খুশি করা। ছোট বস্তু দিয়েও একজনকে খুশি করা যায়। এটা ভাববেন না যে, যে পরিমাণ টাকার হাদিয়া দিলো, সে পরিমাণই আমাকেও দিতে হবে। প্রয়োজনে ঋণ করে কিংবা সুদ-ঘুষ টাইপের কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে হলেও ওই পরিমাণ টাকা হাদিয়া আমাকে দিতেই হবে। এ জাতীয় কোনো চিন্তাও করবেন না। বরং নিজের সাধ্যানুযায়ী যা পারেন, তা-ই বিনিময় হিসাবে দিতে পারেন।

প্রশংসা করাও এক প্রকার বিনিময়

আলোচ্য হাদীসে বিনিময় প্রদানের আরেকটি চমৎকার পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে। যদি তোমার কাছে হাদিয়ার বিনিময় দেয়ার মত কোনো বস্তু না থাকে, তাহলে তুমি হাদিয়াদাতার প্রশংসা করবে। তখন মানুষের কাছে বলতে থাক যে, অমুক ভাই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। হাদিয়াস্বরূপ আমাকে একটা দরকারী জিনিস দিয়েছেন। এভাবে বলে হাদিয়াদাতার মন জয় করে নিন। এটাও এক প্রকার বিনিময়।

ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর অভ্যাস

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকতা প্রকাশার্থে তোমার কাছে হাদিয়া নিয়ে আসে, তাহলে অন্তত আনন্দ প্রকাশ করে হলেও তাকে খুশি করে দাও। এমন আনন্দ প্রকাশ কর, যেন সে বুঝতে পারে যে, তার হাদিয়া পেয়ে তুমি দারুণ খুশি হয়েছ।

আমি নিজে হযরতকে দেখেছি, কোনো ব্যক্তি তাঁকে হাদিয়া দিলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে তা গ্রহণ করতেন। বলতেন, ভাই! এটা তো আমার খুব পছন্দের জিনিস। ভাবছিলাম, বাজার থেকে এ জিনিসটা কিনে আনবো। এ জাতীয় কথা তিনি মূলত হাদিয়াদাতাকে খুশি করার জন্য বলতেন। এর মাধ্যমে আলোচ্য হাদীসের উপরও তাঁর আমল হয়ে যেতো। মূলত কারো অনুগ্রহের কথা প্রকাশ না করা অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

গোপনে হাদিয়া দেওয়া

একবারের ঘটনা। ডা. আবদুল হাই (রহ.) এর কাছে এক ব্যক্তি এলো। মুসাফাহা করার সময় গোপনে কিছু হাদিয়া দেওয়ারও একটা পদ্ধতি আছে। লোকটি এ পদ্ধতির উপর আমল করলো।

এমনটি করতে দেখে তিনি লোকটিকে বললেন, আপনি এ কী করছেন? লোকটি উত্তর দিলো, হযরত, অনেক দিন থেকে মন চাচ্ছিলো আপনাকে কিছু হাদিয়া দেবো। তাই কিছু হাদিয়া দিলাম।

হযরত তাকে বললেন, বলুন তো গোপনে হাদিয়া দেয়ার মাঝে এমন কী তাৎপর্য আছে? আপনি কি চুরি করছেন, না আমি চুরি করছি? আমরা কেউ চুরি করছিনা। বরং আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীসের উপর আমল করতে চাচ্ছেন। সুতরাং এটা গোপনে পালন করার কী আছে? এটা আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সবার সামনেই হাদিয়া দিন। এতে কোনো অসুবিধা তো নেই।

সারকথা হলো, হাদিয়া মানে আন্তরিকতা। ছোট-বড় যেকোনো হাদিয়াই আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাই আন্তরিকতার বিনিময়ে আন্তরিকতা প্রকাশ কর। কমপক্ষে তার প্রশংসা কর।

সংকটের সময় অধিক দুরূদ পড়তে বলা হয় কেন?

একবার ডা. আবদুল হাই (রহ.) বললেন, সংকটের সময় তোমরা অধিকহারে দুরূদ পড়। তারপর তিনি এর কারণ হিসাবে বললেন, আমার অন্তরে একটি কথা জাগে। তাহলো, হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর যে কোনো উম্মত যখনই দুরূদ পাঠ করে, তখনি ফেরেশতাগণ তা রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে যায় এবং আবেদন করে, আপনার অমুক উম্মত আপনার প্রতি হাদিয়াস্বরূপ এ দুরূদখানা পাঠিয়েছে। আর রাসূল (সা.) যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর স্বভাব ছিলো, তাঁকে কেউ কোনো হাদিয়া দিলে তিনিও তাকে কিছু হাদিয়া দিতেন।

উক্ত দুটি বিষয়কে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুরূদ পাঠানোর পর তিনি এর বিনিময় দিবেন না–এটা কখনও হতে পারে না। বরং অবশ্যই তিনি এর বিনিময় দিবেন। আর সেই বিনিময়টা হবে এই–তিনি ওই উম্মতের জন্য দু'আ করবেন যে, হে আল্লাহ! তার সমস্যার সমাধান করে দিন। আর 'ইনশাআল্লাহ' এ দু'আর বরকতে আল্লাহ তোমার সংকট দূর করে দেবেন। সুতরাং সংকটকালে অধিকহারে দুরূদ পড়বে।

সারকথা

সারকথা হলো, আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমত আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, উপকারের বিনিময়ে উপকার করবে। এটা পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের নিয়তে করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া দিতেন এবং উপকারের বিনিময়ে উপকার করতেন। তাউ তুমিও তাঁরই অনুসরণের নিয়তে করবে। এক্ষেত্রে অপরের হাদিয়াকে ঋণ মনে করবেনা যে, অবশ্যই তোমাকে ওই পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। নিজেও বিনিময় পাওয়ার আশায় হাদিয়া দিবেনা। বরং নিয়ত থাকতে হবে, সুন্নাত পালনের মাধ্যমে এক মুসলমানের অন্তর জয় করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব

"মসজিদ মানে ইসলামের এক শক্তিশালী কেন্দ্র। যেখান থেকে তৈরী হবে সৎ ও নেক মানুষের জামাত। ঈমান, আখলাক ও সামাজিকতাসহ সবকিছুর শিক্ষা ও নির্দেশনা এখানেই পাওয়া যেতে হবে। মানবতার বিনির্মাণে মসজিদভিত্তিক কর্মসূচীই হতে হবে সবচে শক্তিশালী। শুধু বাহ্যিক নির্মাণ নয়— বরং বাতেনী নির্মাণের ক্ষেত্রেও মসজিদের ভূমিকা হতে হবে অনন্য।"

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ○ (سورة التوبة ١٨)

اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

আল্লাহর মসজিদসমূহ নির্মাণ তারা করে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও পরকালের উপর। (সূরা তাওবাহ : ১৮)

শুরুর কথা

মুহতারাম সভাপতি, সুপ্রিয় সুধী ও সম্মানিত উপস্থিতি! আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু।

আজ আমরা সৌভাগ্যবান। কারণ, মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আমরা আজ অংশগ্রহণ করছি। মসজিদ নির্মাণ করা কিংবা এ মহান কাজে নিজেকে যে কোনোভাবে শরিক করার সৌভাগ্য কজনেরই বা হয়!

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর ঘর-মসজিদ নির্মাণ করার সৌভাগ্য তো হয় তাদের যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও আখেরাতের উপর। সুতরাং মসজিদ নির্মাণ করা ঈমানের আলামত।

একজন মুসলমানের ঈমানের প্রথম দাবী।

মসজিদের মর্যাদা

ইসলামী সমাজে মসজিদের শান-শওকত কত বেশি, তা কোনো মুসলমানের অজানা নয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, 'নামায ইসলাম-ধর্মের খুঁটি। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, সে কায়েম করে দ্বীনকে। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয়, সে গুঁড়িয়ে দেয় দ্বীনের খুঁটিকে'।

আর সেই নামাযই আল্লাহর কাছে প্রিয়, যা পড়া হয় জামা'আতের সাথে।'

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, বাসা-বাড়িতে আদায়কৃত নামায অসম্পূর্ণ নামায। পরিপূর্ণ নামায জামা'আতের নামায।

মুসলমান ও মসজিদ

এ কারণেই মসজিদ নির্মাণ মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য, এটা তাদের ঐতিহ্য। মাথা গুজানোর জন্য ঘর-বাড়ি নির্মিত হোক বা না হোক মসজিদ নির্মাণ তারা করেই। যেখানেই তারা গিয়েছে, তাদের এ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর তারা রেখেছে। কঠিন ও সঙ্গীন পরিবেশেও তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য-বিভা ছড়িয়েছে।

আর্থিক অনটন কিংবা অন্য কোনো বিপর্যয়ও তাদেরকে এ পবিত্র কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ঘটনা

মনে পড়ে, বিগত সাত বছর আগে আমি গিয়েছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকা আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণের একটি দেশ। যেখানে রয়েছে পৃথিবীখ্যাত ক্যাপটাউন শহর। ক্যাপটাউনে আমি দেখেছি, তাদের অধিকাংশই মালয়ী। 'মালয়ী' এর আধুনিক নাম 'মালেশিয়ান'। সেখানকার মুসলিম বাসিন্দাদের শতভাগই মালয়ী। জিজ্ঞেস করলাম, মালয়ীরা এতদূর এলো কিভাবে? এর উত্তরে আমি যা শুনেছি, তা এক ইতিহাস। আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এক দীর্ঘ ইতিহাস।

ক্যাপটাউনে মালয়ীদের আগমন

আমার শোনা সেই ইতিহাস এই– তখন ছিলো ইংরেজ শাসনামল। মালয়ীদের উপর ছিলো ইংরেজদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব। পাক-ভারতের মতই মালয়ীদেরকেও তারা গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু মালয়ীদের মধ্যে তখন এমন কিছু জিন্দাদিল মুসলমান ছিলো, যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। গোলামী নয়; বরং মুক্তির জন্য তারা জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য যে অস্ত্র-বারুদ প্রয়োজন এসব মুসলমানের কাছে ছিলোনা। ফলে ইংরেজরা বিজয় লাভ করে এবং এদেরকে বন্দি করে ফেলে।

পরাজিত এসব মুসলমানকে তারা হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে নিয়ে আসে ক্যাপটাউনে। বাধ্য হয়ে তারা শুরু করে গোলামী জীবন। আজ যারা মানবাধিকারের কথা বলছে, বিশ্বকে ধর্মীয় স্বাধীনতার সবক শেখাচ্ছে–এসব ইংরেজ-ইউরোপীয়ানরাই একটি স্বাধীন গোষ্ঠীকে সেদিন হাতে-পায়ে বেড়ি পরতে বাধ্য করেছে। শুধু তা-ই নয়, বরং কেড়ে নিয়েছে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও। তাদেরকে কোথাও নামায পড়তে দেয়া হতো না। এমনকি বাসা-বাড়িতেও না। নামায পড়তে দেখলেই চাবুকের আঘাতে তারা রক্তাক্ত হতে হতো। এতই নির্দয় ও সংকীর্ণমনা ছিলো এসব ইংরেজ-ইউরোপিয়ান।

নির্জন রাতে নামায আদায়

যখন মুসলমানদেরকে তারা দিনের বেলায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে বাধ্য করতো, তখনও তাদের পায়ে বেড়ি থাকতো। সন্ধ্যার পর যখন মনিবরা ঘুমিয়ে পড়তো, শুধু তখন এদের পায়ের বেড়ি খুলে দেয়া হতো। খুলে দেয়া হতো ঘুমানোর জন্য এবং দিনের পরিশ্রম যেন ভালোভাবে করতে পারে তার জন্য। আল্লাহু আকবার! কিন্তু আল্লাহর এসব বান্দার ঈমানী জযবা দেখুন! এরা নিজেদের মনিবের ঘুমানোর অপেক্ষায় থাকতো। সবাই যখন ঘুমে হারিয়ে যেতো, তখন এসব আল্লাহর বান্দা চুপি-চুপি চলে যেতো নিকটের পাহাড়চূড়ায়। সেখানে গিয়ে একসঙ্গে পুরো দিনের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করতো।

এভাবেই কেটে যায় তাদের দীর্ঘ কয়েক বছর।

নামায পড়ার অনুমতি দিন

আল্লাহর হেকমত বোঝার সাধ্য কার আছে বলুন! ক্যাপটাউনের উপর আক্রমণ করলো ডাচরা। ইংরেজরা তো জানতো এসব মালয়ী মুসলমান

যোদ্ধাজাতি, যাদের বীরত্ব তারা স্বচক্ষে দেখেছিলো। তাই তারা মালয়ীদেরকে বললো, আমাদের দুশমন ডাচবাহিনী। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। কোনোভাবেই ক্যাপটাউন কব্জা করতে দিবেনা। এ দায়িত্ব তোমরা পালন করবে। তাই তোমাদেরকে ডাচদের বিরুদ্ধে আগে বাড়িয়ে দিচ্ছি। মালয়ীরা উত্তর দিলো, আমরা মুসলমান। তোমরা আমাদেরকে গোলাম বানিয়েছো। আমাদের কাছে ইংরেজ আর ডাচ সমান। কারণ, ডাচরা জয়ী হলে তারাও আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে নিবে। তাই তোমাদের কথায় আমরা লড়তে রাজি আছি। তবে আমাদের একটা দাবী আছে। এ ক্যাপটাউনের জমিনে আমাদেরকে নামায পড়ার অনুমতি দিতে হবে। এজন্য একটি মসজিদ নির্মাণেরও সুযোগ দিতে হবে।

একটাই দাবী– মসজিদ নির্মাণের অনুমতি

দেখুন, মুসলমানরা ইংরেজদের কাছে টাকা-পয়সা চায়নি, মুক্তির দাবী করেনি কিংবা অন্য কোনো পার্থিব কামনাও করেনি। তাদের ছিলো একটাই দাবী–নামায পড়ার জন্য মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিতে হবে। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে তাদের এ দাবী মেনে নিলো। অবশেষে মুসলমানরা ডাচদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়লো। এমনকি ডাচদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে এনে দিলো। ইংরেজরাও তাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়ে দিলো।

এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যাপটাউনের প্রথম মসজিদ।

এখানেই শেষ নয়।

সে সময় তারা তো ছিলো সর্বহারা। এজন্য তাদেরকে আরো অনেক কষ্ট-ক্লেশ পোহাতে হয়। টাকা-পয়সা, ইট-সুরকি মোটকথা নির্মাণের কোনো সামগ্রী তাদের হাতে ছিলোনা। এমনকি সঠিকভাবে কেবলা নির্ণয়ের কোনো যন্ত্রও ছিলোনা। ছিলো শুধু ঈমানী চেতনা।

শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা কেবলা ঠিক করে নেয়, যার ফলে মসজিদ কেবলার সঠিক অবস্থান থেকে ২০-২৫ ডিগ্রী পরিমাণ বাঁকা হয়ে যায়।

আজও ওই মসজিদের কাতার বাঁকাভাবেই আছে।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও ঐতিহ্য এমনই দীপ্তিময়। টাকা-পয়সা নয়, খানা-পিনা নয়, মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়; বরং মুসলমানরা শুধু দাবী করেছে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি। মসজিদ নির্মাণকেই তারা মনে করেছে জীবনের প্রধান দায়িত্ব।

ঈমানের স্বাদ কারা পায়?

মূলত ঈমানের স্বাদ এদের ভাগ্যেই জোটে। আমরা তো পিতা-মাতার সূত্র ধরে মুসলমান। এই দ্বীন পাওয়ার জন্য কোনো কুরবানি আমাদেরকে পেশ করতে হয়নি। ঘরে বসেই পেয়ে গিয়েছি। যার কারণে দ্বীনের প্রতি আমাদের তত দরদ নেই। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আমরা পাই না। যারা এ দ্বীনের জন্য মেহনত করেছে, অসহনীয় যাতনা সহ্য করেছে, কুরবানির-নযরানা পেশ করেছে, তারাই অনুধাবন করতে পারে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ।

আমাদের উচিত শোকর করা

এ ঘটনা কেন শোনালাম? যেন আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফেলতে পারেন–এজন্যই শোনালাম। আজ মসজিদ নির্মাণে আমাদের সামনে কোনো বাঁধা নেই, কোনো টেনশন নেই। যেখানে যখন আমরা চাই মসজিদ বানাতে পারি। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের এ মহান সুযোগ আমাদের জন্য সৌভাগ্যই বলা যায়। মসজিদ তৈরিতে যিনি যেভাবে শরিক হতে পারবেন, তার জন্য তা-ই হবে মহান সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

মসজিদ যেভাবে আবাদ হয়

দ্বিতীয়ত, আপনাদের সামনে আরজ করতে চাই–দেয়াল, ইট, সুরকি, পাথর কিংবা প্লাস্টারের নাম "মসজিদ আবাদ করা নয়। আপনারা জানেন মদীনার মসজিদের ইতিহাস। যে-মসজিদ ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র হাতে মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। ছাদ পাকা ছিলো না, দেয়াল পাকা ছিলোনা। বরং খেজুর পাতার ছাউনি ছিলো। বেড়াও ছিলো খেজুর পাতার। অথচ আপন বিভায় ছিলো সমুজ্জ্বল। মক্কার হারামের পর এমন মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ এ পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয়টি হবেনা। এতে বোঝা যায়, দেয়ালের নাম সমজিদ নয়, মিনারের নামও মসজিদ নয় কিংবা মেহরাব ও ইট-পাথরকেও মসজিদ বলা হয় না। বরং মসজিদ মূলত সিজদা করার স্থানের নাম। সুতরাং মসজিদ যদি হয় সৌন্দর্যমণ্ডিত, নকশাখচিত ও টাকা-পয়সার প্রাচুর্য-সম্বলিত, কিন্তু নামাযীশূন্য, তাহলে বলা হবে, সে মসজিদ আবাদ নয়। এমন মসজিদ তো স্বজনহারা-বিরান মসজিদ। বাহ্যিক চাকচিক্য নয় বরং নামায ও যিকর দ্বারাই মসজিদ আবাদ হয়।

কেয়ামতের নিকটবর্তী যুগে মসজিদগুলোর অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেয়ামতের পূর্বে যেসব ফেতনা ঘটবে, তার বিবরণ উম্মতকে দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তিনি এও বলেছেন–

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ -

অর্থাৎ– দৃশ্যত তখন তাদের মসজিদগুলো আবাদ হবে, নির্মাণশৈলির চতুরতায় সেগুলো ঝকঝক করবে; কিন্তু ভেতরগত অবস্থা হবে নির্জন ও করুণ। কারণ, সেগুলোতে নামাযীর সংখ্যা থাকবে খুবই কম। মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য থাকবে অপূর্ণ।

আল্লামা ইকবাল চমৎকার বলেছিলেন–

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پاپی ہے ، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

ঈমানের উত্তাপে বিগলিত মানুষগুলো মসজিদ তো তৈরী করে দিলো ভরা রাতে, কিন্তু মন তো মোদের পুরনো পাপী, বছরের পর বছর গেলেও নামাযী হতে পারিনি।

শেষ কথা

যাই হোক, তবুও মসজিদ নির্মাণ একটি সৌভাগ্যের কাজ। সৌভাগ্যবানরাই এতে যে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই বলে একথাও ভাবা যাবেনা যে, বিল্ডিং দাঁড় করানোর পরই আমাদের দায়িত্ব শেষ। বরং একে আবাদ করার দায়িত্বও আমাদেরই। তেলাওয়াত, যিক্র তথা ইসলামের অনুশীলন দ্বারা একে আবাদ রাখতে হবে। মূলত মসজিদ মানে ইসলামের প্রধান কেন্দ্র। যেখান থেকে সৎ ও নেক মানুষ তৈরী হবে। ঈমান, আখলাক ও সামাজিকতাসহ সবকিছুর শিক্ষা ও নির্দেশনা এখানেই পাওয়া যেতে হবে। মানবতার বিনির্মাণে মসজিদের কর্মসূচীই হতে হবে সবচে শক্তিশালী। শুধু বাহ্যিক নির্মাণই নয়; বরং বাতেনী বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও মসজিদের ভূমিকা হতে হবে অনন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ দায়িত্বগুলো আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

হালাল উপার্জন অন্বেষণ করুন

"প্রত্যেকেই কাঁদছে। লাখপতিও কাঁদছে, কোটিপতিও কাঁদছে। সকলের চোখে-মুখে অশান্তি ও হতাশার ছাপ। সকলেই বলে, যা উপার্জন করি, তাতে প্রয়োজন মেটে না। এটা মূলত বরকতশূন্যতার কারণেই হচ্ছে। এর উৎস হলো হালাল-হারামের সংমিশ্রণ। আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু উপার্জনকে হারাম মনে করে তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা হয়ত করি। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমাদের হালাল উপার্জনের ভেতর হারামটাও ঢুকে যাচ্ছে—এদিকে আমাদের অনেকের খেয়ালই নেই।"[১]

হালাল উপার্জন অন্বেষণ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَالْفَرِيْضَةِ –

(كنـــزالعمال جلد ٤ حديث نمبر ٩٢٣١)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হালাল রিযিক খোঁজ করা দ্বীনের প্রথম পর্যায়ের ফরযগুলোর পর একটি ফরয।

আলোচ্য হাদীসটি সনদের বিবেচনায় যদিও ততটা শক্তিশালী নয়, তবে মর্মবিচারে একে ওলামায়ে কেরাম গ্রহণযোগ্য বলেছেন। উম্মতের আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তাৎপর্য-বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি মূলনীতির আলোচনা করেছেন। তাহলো, হালাল রিযিক খোঁজ করা দ্বীনের প্রথম পর্যায়ের ফরযগুলোর পর অন্যতম ফরয। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত হলো দ্বীনের প্রথম পর্যায়ের ফরয। এ ফরযগুলোর পর দ্বীনের দ্বিতীয় ধাপের ফরয হলো হালাল রিযিক খোঁজ করা। হাদীসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। তবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একজন মুসলমানের অন্তরে যদি হাদীসটির মর্ম প্রবেশ করে, তাহলে ইসলামের অনেক কিছু জেনে যাবে।

হালাল রিযিক অন্বেষণ করা দ্বীনের অংশ

এ হাদীস দ্বারা প্রথমত যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়, তাহলো, হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে আমরা যেসব কাজকর্ম করি, যথা– ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-জিরাত, চাকরি-বাকরি–এগুলো দ্বীনের বাইরে নয়। বরং দ্বীনের অংশ। ইসলাম শুধু এসব কাজ কর্মের অনুমতিই দেয়নি; বরং ফরয হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। দ্বীনের প্রথম পর্যায়ের ফরযগুলোর পরই এ ফরযের অবস্থান। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি হালাল উপার্জনের চেষ্টা-তদবির না করে, হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকে, তাহলে সে ফরয আদায় করার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা, শরীয়তের বক্তব্য হলো, মানুষ যেন অলস ও অচল হয়ে ঘরে বসে না থাকে। সে যেন অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত না পাতে। বেকারত্ব ও অপরের কাছে হাত পাতা অভিশাপতুল্য। এ থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) হালাল জীবিকা অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিজন মানুষকেই নিজের সাধ্যানুযায়ী হালাল রিযিক অন্বেষণ করতে বলেছেন। কারণ, আমাদের উপর যেমন আল্লাহ তা'আলার কিছু হক আছে, অনুরূপ কিছু হক আছে নিজের শরীর-সত্তা ও পরিবারের লোকজনদেরও। এই হক আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হালাল উপার্জন ব্যতীত এসব হক আদায় করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহপ্রদত্ত এসব হক আদায় করার প্রয়োজনেই প্রতিটি মানুষকে হালাল রিযিক অন্বেষণ করতে হবে।

ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই

হাদীসটির মাধ্যমে মূলত বৈরাগ্যতার শিকড়কেও উপড়ে ফেলা হয়েছে। স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, ইসলামে বৈরাগ্যতার কোনো স্থান নেই। খ্রিস্টধর্মের আবিষ্কৃত বৈরাগ্যবাদ ইসলাম ধর্মে অচল। খ্রিস্টানরা একে আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ মনে করতো। তারা মনে করতো, আল্লাহকে পেতে হলে পার্থিব কাজকর্ম ছাড়তে হবে, রিপুর যাবতীয় কামনাকে মিটিয়ে দিতে হবে। তারপর জঙ্গলে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হবে। এ পথ ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টিগতভাবেই তাদের মধ্যে জৈবিক চাহিদা রেখেছি। তাদেরকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দিয়েছি। বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘরের প্রয়োজন। একজন সুস্থ মানুষের জন্য এগুলো তার সৃষ্টিগত চাহিদা। এ চাহিদাগুলো আমিই তার মাঝে রেখেছি। তারপর আমি মানুষের কাছে দাবী করেছি, সে তার এ চাহিদাগুলো পূর্ণ করবে। সেই সাথে পূর্ণ করবে আমার অধিকারগুলোও। যদি কোনো ব্যক্তি এ উভয় চাহিদা যথাযথভাবে পূর্ণ করতে পারে, সে-ই হবে সত্যিকারের মানুষ। কিন্তু

কোনো ব্যক্তি যদি ধ্যানমগ্ন হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে সে যতই ধ্যান করুক, সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হালাল রিযিক

দেখুন, এই পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রত্যেককে দিয়েই হালাল উপার্জনের কাজ করিয়েছেন। সকল নবী-রাসূলই হালাল উপার্জনের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম করেছেন। কেউ মজুরি করেছেন, কেউ কাঠমিস্ত্রির কাজ করেছেন, কেউ বা অন্যের ছাগল চরিয়েছেন। স্বয়ং রাসূল (সা.) মক্কার পাহাড়ি এলাকায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ছাগল চরিয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন, আমার এখনও মনে আছে, আমি মক্কার আজইয়াদ পাহাড়ের পাদদেশে মানুষের ছাগল চরিয়েছি।

তিনি ব্যবসাও করেছিলেন। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দুইবার সিরিয়া সফর করেছেন। মদীনা থেকে নিকটতম দূরত্বে জুরুফ নামক এলাকাতে তিনি কৃষিকাজ করেছেন। অর্থাৎ– সমকালীন প্রচলিত সব পন্থায় তিনি হালাল রিযিক উপার্জনে শরিক হয়েছেন। সুতরাং কেউ যদি চাকরি-বাকরিও করে, সেও এ নিয়ত করতে পারবে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণে চাকরি করছি। কৃষকও এ জাতীয় নিয়ত করতে পারবে। তাহলে এসবই দ্বীনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মু'মিনের দুনিয়াও দ্বীন

আমরা মনে করি, দ্বীন ও দুনিয়া ভিন্ন জিনিস। এ হাদীস আমাদের এ ভুল ধারণাও ভেঙ্গে দিয়েছে। কারণ, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একজন মু'মিন বান্দার দুনিয়াও দ্বীন। কারণ, তার পার্থিব কাজ, যেমন– জীবিকার জন্য তার চেষ্টা-শ্রম–এটাও মূলত দ্বীন। তবে শর্ত হলো, উপার্জনের পন্থা হালাল হতে হবে এবং রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে হতে হবে। সারকথা হলো, হাদীসটি থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম, হালাল উপার্জন খোঁজ করা দ্বীনেরই অংশ। যদি কারো মনে একথাটি বদ্ধমূল হয়ে যায়, তাহলে গোমরাহির অনেক পথ থেকে সে বেঁচে যেতে পারবে।

তাওয়াক্কুল করে সুফিয়ায়ে কেরামের জীবিকা উপার্জন থেকে বিরত থাকা

সুফিয়ায়ে কেরামের কারো-কারো সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা উপার্জনের জন্য কোনো পেশা অবলম্বন করেননি। হালাল উপার্জনের খোঁজে তাঁরা কোনো

কাজই করতেন না। বরং তাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা করে জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের জায়গায় বসে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য থেকে তাঁদের জন্য যতটুকু রিযিক ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরা ততটুকুতেই সন্তুষ্ট রয়েছেন। এর উপর আল্লাহর শোকর আদায় করেছেন। কোনো ব্যবস্থা না হলে সবর করেছেন।

এটা অবশ্য সব সুফিয়ায়ে কেরামের আমল ছিলোনা। বরং কোনো-কোনো সুফি এমনটি করেছেন।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সুফিয়ায়ে কেরামের এ জাতীয় আমলের পেছনে দু'টি কারণের যে কোনো একটি কারণ ক্রিয়াশীল ছিলো। প্রথম কারণ, তাঁরা হয়ত সবসময় বিশেষ অবস্থা ও ধ্যানে এতটা ডুবে থাকতেন যে, সাধারণ অনুভূতিও তাদের মাঝে জাগতো না। আর কোনো মানুষ যখন সাধারণ উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে বাধ্য থাকেনা। এ কারণে কোনো কোনো সুফির এ আমল উম্মতের সাধারণ মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য অবশ্যই নয়।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলা যায়, যেসব সুফি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে জীবিকা উপার্জন থেকে বিরত থাকতেন, তাঁদের তাওয়াক্কুল মূলত অনেক শক্তিশালী ছিলো। তাঁরা এর মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তুষ্টি উপলব্ধি করতেন। মাসের পর মাস অনাহারে কাটালেও তারা ব্যথিত হতেন না। তাঁদের ভাবটা ছিলো এমন যে, ক্ষুধা কোনো ব্যাপারই নয়। সুতরাং ক্ষুধার তাড়নায় আমরা কারো কাছে হাত পাতবো না। কারো কাছে অভিযোগ করবো না।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত উঁচুস্তরের মানুষ। সবসময় যিক্‌র ও ফিক্‌রে মগ্ন থাকতেন। যার ফলে দীর্ঘ সময় তাঁদেরকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। কিন্তু মোটেও বিচলিত হননি। উপরন্তু তাদের সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের হক জড়িত ছিলো না। তাঁদের স্ত্রী-সন্তান ছিলোনা। সুতরাং তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিলো আলাদা। আমাদের মত দুর্বলদের পক্ষে তাঁদের মতো হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের জন্য পথ হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাতলানো পথ। তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, হালাল রিযিক অন্বেষণ করা অন্যতম ফরয।

অন্বেষণ হবে হালালের

আরেকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাহলো রিযিক অন্বেষণ করা তখনই ফরয হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন অন্বেষণ হবে হালালের। এখানে ভাত-কাপড় কিংবা পয়সা অন্বেষণ সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নয় যে, হালাল-হারাম যে কোনোভাবেই কিছু অর্থ উপার্জন করে নিলাম। কারণ, সত্তাগতভাবে যদি

এগুলো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হাদীসে হালাল অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে যেসব ফযিলত ও মর্যাদা বিবৃত হয়েছে, সেগুলো নিরর্থক হয়ে যাবে। মু'মিনের এ আমল তখনই দ্বীন ও ফরয হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন সে এটা ইসলামী শিক্ষামতে উপার্জন করবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের বিভেদ ভুলে বসে, তাহলে তো একজন মুমিন-মুসলমান এবং একজন বেদীন-কাফেরের রিযিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলোনা। সুতরাং হালাল রিযিক অন্বেষণ করা তখনই একটি মর্যাদাপূর্ণ আমল হবে, যখন তা শরীয়তের আরোপিত সীমানার ভেতরে থেকে করা হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও বিধান পরিপন্থী উপায়ে যত বিশাল অর্থ-বৈভবই আসুক, সেটাকে জাহান্নামের অঙ্গার মনে করতে হবে। একজন মুসলমান কোনো অবস্থাতেই সেটাকে নিজের জীবনের কাজ হিসেবে মেনে নিতে পারেনা।

শ্রমের সকল উপার্জন হালাল হয় না

আমাদের সমাজে অনেকেই জীবিকা অন্বেষণের এমন পথ গ্রহণ করে বসে আছে, যেটাকে ইসলাম হারাম আখ্যা দিয়েছে। যেমন– কেউ-কেউ সুদকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে। এখন যদি তাকে বলা হয়, এটা তো হারাম পথ। এভাবে পয়সা কামানো জায়েয নয়। তখন সে বলে, আমরা নিজেদের শ্রমের পয়সা খাচ্ছি। মেধা-শ্রম ও সময় ব্যয় করে উপার্জন করছি। এরপরেও যদি এটা নাজায়েয হয়, তাহলে আমরা কী করবো? খুব ভালোভাবে বুঝে নিন, যেকোনো শ্রমই শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার দেয়া পথ ও পদ্ধতিতে যে শ্রম ব্যয় করা হয়, সেটাই হয় জায়েয ও বৈধ। সুতরাং আল্লাহর বিধানপরিপন্থী পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত পয়সা হালাল হতে পারে না। অতএব উপার্জনের কোনো সুযোগ সামনে এলেই সর্বপ্রথম দেখতে হবে, এ পথটা জায়েয, না নাজায়েয। শরীয়ত যদি সেটাকে হারাম বলে, তাহলে এ পথে উপার্জিত সকল পয়সাই হারাম হিসাবে গণ্য হবে।

ব্যাংকের চাকুরিজীবী কী করবে?

অনেকে ব্যাংকে চাকরি করে, যেখানে সুদি লেনদেন হয়। যে ব্যক্তি চাকরি করছে, সে যদি এসব লেনদেনে সহযোগী হয়, তাহলে তার এ চাকরিও হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে এ জাতীয় চাকরিরত থাকে এবং তাকে যদি আল্লাহ হিদায়াত দান করেন, তাহলে তাকে চাকরিটা ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করতে হবে। তাকে বৈধ

কোনো পথ খুঁজে বের করতে হবে। বৈধ পথ পাওয়ার পর সঙ্গে-সঙ্গে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। তবে বৈধ উপার্জনের পথ এমনভাবে খোঁজ করতে হবে, যেমনভাবে একজন বেকার মানুষ চাকরি খুঁজে বেড়ায়। যদি কোনো ব্যক্তি নিশ্চিন্তে বসে থাকে আর ভাবে, যদি বৈধ চাকরি পাই, তাহলে সুদি চাকরিটা ছেড়ে দেবো, তাহলে এটা ঠিক হবেনা। বরং তাকে একজন বেকার মানুষের মতই হালাল চাকরি খুঁজে বেড়াতে হবে। এমনকি হাতে যদি ব্যাংকের চাকরির চাইতে কম উপার্জনের বৈধ চাকরিও এসে যায়, তাহলেও এটা ছেড়ে দিয়ে হালাল উপার্জনের পথ ধরতে হবে।

হালাল উপার্জনের বরকত

আল্লাহ তা'আলা হালাল উপাজনের মধ্যে বরকত রেখেছেন– হারাম উপার্জনের মধ্যে তা রাখেন নি। হারামের বিশাল অংকের পয়সা দিয়ে একজন মানুষ তা করতে পারে না, যা স্বল্প পরিমাণের হালাল পয়সা দিয়ে করা যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) অযুর পর সব সময় এ দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ –

(ترمذى، كتاب الدعوات ، باب دعاء يقال فى الليل)

'হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আমার ঘরে স্বচ্ছলতা দান কর। আমার রিযিকে বরকত দাও।'

বর্তমানের মানুষ বরকতের মর্ম বোঝেনা, তারা চায় অর্থের প্রাচুর্য্য। ব্যাংক-ব্যালেন্সের টাটকা নোটে তারা আত্মতৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু ভেবে দেখেনা, এ বিশাল অংক তার কতটুকু উপকারে এলো। কতটুকু সুখ বা শান্তি দিলো। এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে; অথচ জীবনের কোথাও সামান্য সুখ নেই, শান্তি নেই। বলুন, তাহলে এই অর্থ তার কী উপকারে এসেছে?

আসলে অর্থপ্রাচুর্যে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও যদি আল্লাহ কাউকে সুখ-শান্তি দান করেন, তাহলে বুঝতে হবে এটাই বরকত। বরকত এমন এক সম্পদ, যা বাজারে বেচাকেনা হয় না। লক্ষ-কোটি টাকা দিয়েও স্বল্প পরিমাণের বরকত কেনা যায় না। এটা একান্তই আল্লাহর দান ও দয়া। আল্লাহ যাকে দান করেন, সে-ই বরকত লাভে ধন্য হয়। তবে বরকত আসে কেবল হালাল উপার্জনে। হারামে বরকত আসেনা। এজন্যে প্রত্যেক মানুষকেই চিন্তা করা উচিত, আমি এবং আমার স্ত্রী-সন্তান যা খাচ্ছি, তা কি হালাল? এতে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে?

বেতনের এ অংশ হারাম হয়ে গেলো

এমন কিছু হারাম অর্থ আছে, যা সকলেই জানে। যেমন সুদ-ঘুষ হারাম–এটা কারো অজানা নয়। কিন্তু কিছু উপার্জিত অর্থ আছে, যেগুলোর বিধান আমরা সবাই জানি না। যেমন– এক ব্যক্তি শরীয়ত-সমর্থিত পথে কোথাও চাকরি করছে। তবে চাকরি নেয়ার সময় যতটুকু সময় চাকরিতে ব্যয় করার কথা ছিলো, চাকুরি করার সময় সে ততটুকু সময় ব্যয় করেনা। যেমন–কথা ছিলো সে আট ঘণ্টা করে ডিউটি করবে। কিন্তু সে করে সাত ঘণ্টা। এক ঘন্টা ফাঁকি দেয়। এখন এ ব্যক্তি মাস শেষে যে বেতন নেবে তার বেতনের আটভাগের এক ভাগ হারাম বলে গণ্য হবে। অথচ এ বিধানটা আমাদের অনেকের জানা নেই। আমরা এভাবে চিন্তাও করিনা। অথচ এভাবেই হারামটা আমাদের হালাল উপার্জনের ভেতরে অনুপ্রবেশ করছে।

থানাভবন মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন কম নেয়া

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এর খানকাতে একটি মাদরাসা ছিলো। সেখানে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে একটি ডায়েরী থাকতো। যেমন–এক শিক্ষকের দায়িত্ব ছিলো, তিনি সবক পড়াবেন ছয় ঘন্টা। কিন্তু এর মধ্যে কোনো মেহমান এলো। ফলে মেহমানের পেছনে তাকে কিছু সময় ব্যয় করতে হলো। তখন তিনি ওই সময়টুকু নিজ ডায়েরিতে নোট করে রাখতেন। মাস শেষে তিনি মাদরাসা-অফিসে দরখাস্ত দিয়ে জানাতেন, আমি এতটুকু সময় মেহমানের পেছনে ব্যয় করেছি। সুতরাং এর বেতন যেন কেটে রাখা হয়। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারী দরখাস্ত দিয়ে বেতন কাটাতেন। শুধু মেহমানই নয়, বরং নিজের ব্যক্তিগত কাজে সময় ব্যয় হলে সেটাও ডায়েরীতে নোট করে রেখে বেতন কর্তন করাতেন। এভাবেই তাঁরা হালালের মাঝে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটানো থেকে বেঁচে থাকতেন। অথচ বর্তমানে আমরা এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিনা।

ট্রেনে সফরকালে পয়সা বাঁচানো

অনুরূপভাবে ট্রেনে সফরকালে এক ব্যক্তি যে ক্লাসের টিকেট কেটেছে, যদি সে এর উপরের ক্লাসে গিয়ে বসে পড়ে, তাহলে ভাড়ার যে ব্যবধানটা রয়েছে সে টাকাটা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এভাবে তার হালাল উপার্জনের সঙ্গে হারামটাও ঢুকে যায়। আর আমাদের সমাজে হালাল-হারামের এ জাতীয় খিচুড়ি অহরহ গেলা হচ্ছে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর একটি সফর

হযরত থানবী (রহ.)-এর সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখতেন, তারা ট্রেনের সফরের সময় নিজেদের মালপত্র অবশ্যই ওজন করাতেন। একজন যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের মালপত্র নেয়ার অনুমতি আছে। এর অতিরিক্ত হলে ওজন করিয়ে তার ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। তারা সেই ভাড়াটা পরিশোধ করাতেন, তারপর ট্রেনে উঠতেন। এক্ষেত্রে তাদের এ সতর্কতা ছিলো সর্বজন প্রসিদ্ধ।

একবারের ঘটনা। থানবী (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। রেল স্টেশনে গিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন মালপত্র ওজন করার কাউন্টারে। ঘটনাক্রমে সেখানের কর্মরত ব্যক্তি থানবী (রহ.)-কে চিনতো। তাই সে থানবী (রহ.)-কে দেখেই আদবের সঙ্গে বললো, হযরত এখানে কেন এসেছেন? হযরত উত্তর দিলেন, মালপত্র ওজন করাতে এসেছি, যেন এর ভাড়া দিতে পারি। লোকটি বলল, আপনাকে ভাবতে হবেনা। আপনি নিশ্চিন্তে সফর করুন। আমি আপনার সঙ্গে আছি। আমি এ ট্রেনের গার্ড। কেউ আপনাকে সামানপত্রের কথা জিজ্ঞেসও করবেনা।

থানবী (রহ.) তাকে বললেন, আমার সাথে আপনি কোন পর্যন্ত যাবেন? সে বললো, অমুক স্টেশন পর্যন্ত যাবো। থানবী (রহ.) বললেন, তারপর কী হবে? সে উত্তর দিলো, আমি পরবর্তী গার্ডকে বলে দেবো। সে আপনার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে। থানবী (রহ.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, ওই গার্ড কতদূর যাবে? সে উত্তর দিলো, আপনি যে স্টেশন পর্যন্ত যাবেন গার্ডও সেই স্টেশন পর্যন্ত যাবে। সুতরাং আপনাকে এ নিয়ে ভাবতে হবেনা।

হযরত থানবী (রহ.) বললেন, আমাকে আরো বহু দূর যেতে হবে। লোকটি বললো, তারপর আর কোথায় যাবেন? থানবী (রহ.) বললেন, সেই স্টেশন থেকে আমাকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। তাঁর সামনে গিয়ে তো আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। বলুন, সেখানে কি কোনো গার্ড যাবে?

তারপর থানবী (রহ.) বললেন, দেখুন, আপনারা এ ট্রেনের মালিক নন। তাই এর উপর কর্তৃত্ব চালাবার অধিকার আপনাদের নেই। বিনা ভাড়ায় যাত্রী বা মাল বহন করার অধিকার ট্রেন কর্তৃপক্ষ আপনাদেরকে দেয়নি। কাজেই পরিচয়ের সুবাদে আপনি আমার হয়ত কয়েকটা টাকা বাঁচিয়ে দিলেন, কিন্তু এ টাকা কয়টি তো আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আখেরাতে এ হারাম সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। তখন তো আর সেখানে আপনি আমার পক্ষ হয়ে জবাব দেবেন না।

হযরতের এ কথাগুলো শুনে গার্ডও বিষয়টি বুঝতে পারলো। তারপর তিনি মালপত্র ওজন করে ভাড়া আদায় করলেন এবং ট্রেনে উঠে পড়লেন।

হালালের ভেতর হারাম ঢুকে গেলো

সুতরাং ট্রেন হোক কিংবা বিমান হোক নির্ধারিত সামানপত্রের চাইতে বেশি সামানা বহন করার কারণে যে পয়সা বেঁচে যাবে, তা হারাম হিসাবেই বিবেচিত হবে। আমাদের অলক্ষ্যে এভাবেই হালালের ভেতর হারাম ঢুকে যাচ্ছে। ফলে আমাদের জীবনযাত্রা বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। এ কারণেই আমরা অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। প্রত্যেকেই কাঁদছে। লাখপতিও কাঁদছে, কোটিপতিও কাঁদছে। প্রত্যেকের চোখে-মুখে শুধু অশান্তির ছাপ। সকলেই বলে, যা উপার্জন করি, তাতে প্রয়োজন মিটেনা। এটা মূলত বরকতশূন্যতার কারণেই হচ্ছে। এর উৎস হলো, হালাল-হারামের সংমিশ্রণ। আমরা সুনির্দিষ্ট কিছু উপার্জনকে হারাম মনে করে তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা হয়ত করি, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমাদের হালাল উপার্জনের ভেতর হারামটাও ঢুকে যাচ্ছে-এ দিকে আমাদের অনেকেরই খেয়াল নেই।

টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিলে চুরি

টেলিফোন অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেশে-বিদেশে কল করে বিল না দেয়া সরকারী অর্থ চুরি করার শামিল। এ চুরির কারণে যে পয়সা বেঁচে যাচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ হারাম। এ হারাম অর্থ রীতিমত আমাদের হালাল উপার্জনের সাথে মিশে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে মিটার ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার করা কিংবা বিকল্প মিটার লাগিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করাও জাতীয় সম্পদ চুরির শামিল, যা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে কত পথ দিয়ে হারাম এসে আমাদের হালালকে হারাম করে দিচ্ছে, তার বিবরণ দেয়াও মুশকিল। যার ফলে কতভাবে যে আমরা বরকতশূন্যতার আযাবে ভুগছি–তার হিসাব দেয়াও কঠিন।

হালাল-হারামের চিন্তা

এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিটি কাজ করার সময় হালাল-হারাম ভেবে দেখা। কেউ যদি এভাবে চিন্তা করে হারাম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, বিশ্বাস করুন, সে যদি জীবনে কোনো নফল না পড়ে, তাসবীহ-তাহলীল আদায় না করে শুধু হারামমুক্ত জীবনযাত্রার কারণে সে মরণের পর সোজা জান্নাতে চলে যেতে পারবে–ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে হালাল-হারামের ভেদাভেদ নেই, তবে তাহাজ্জুদ তার বাদ পড়ে না। ইশরাক-আওয়াবীনও পড়ে, যিক্‌র-আয্‌কারও করে। মনে রাখবেন, তার এসব ইবাদত-বন্দেগী তাকে হারামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এখানে মানুষ তৈরি হয়

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, আজকাল মানুষ যিক্‌র ও শোগল শেখার জন্য খানকায় যায়। এগুলো শেখার জন্য খানকার অভাব নেই। আমি বলি, যিক্‌র ও শোগল শিখতে হলে ওসব খানকায় চলে যাও। আমার এখানে মানুষকে মানুষ বানানোর চেষ্টা করা হয়। জীবন পরিচালনার শরীয়তকর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধান অনুশীলন করানোর কোশেশ করা হয়। এ কারণে দেখা যেতো, কোনো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি সামানপত্র ওজন করার জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টারে গেলে তখন কর্তব্যরত ব্যক্তি বুঝে ফেলতো এ লোকটা নিশ্চয় থানবী (রহ.)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। তাই অনেক সময় তারা নিজেরাই জিজ্ঞেস করতো, আপনি কি থানাভবন থেকে এসেছেন? কিংবা আপনি কি থানাভবন যাচ্ছেন?

থানবী (রহ.)-এর এক খলীফার ঘটনা

একবার থানবী (রহ.) এক খলীফা নিজের ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হলেন থানবী (রহ.)-এর দরবারে। থানবী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, কোথা হতে এসেছেন? খলীফা উত্তর দিলেন, অমুক স্থান থেকে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, ট্রেনে এসেছেন? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ট্রেনে এসেছি। হযরত পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলের ফুল টিকেট করেছেন, না হাফ টিকেট করেছেন?

লক্ষ্য করুন, থানবী (রহ.)-এর খানকায় মুরিদকে তার ছেলের টিকেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। কোনো-কোনো খানকায় তো এ জাতীয় প্রশ্নের কল্পনাও করা যায় না। সেখানে প্রশ্ন করা হয়, তাহাজ্জুদ-ইশরাক পড়া হয় কিনা? অথচ এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ছেলের টিকেট ফুল না হাফ কাটা হয়েছে?

খলীফা উত্তর দিলেন, হাফ টিকেট করা হয়েছে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের বয়স কত? উত্তর দিলেন, ছেলের বয়স তো তের বছর। কিন্তু দেখতে মনে হয় বার বছর, তাই হাফ টিকেট কেটেছি।

একথা শুনে থানবী (রহ.) খুব ব্যথিত হলেন। এমনকি উক্ত খলীফার খেলাফত পর্যন্ত কেটে দিলেন। আরো বললেন, তোমাকে খেলাফত দেয়া আমার ভুল হয়েছে। তুমি এর উপযুক্ত ছিলে না। কারণ, তোমার মধ্যে হালাল-হারামের ভেদাভেদ নেই। যার হারাম থেকে বাঁচার চিন্তা নেই, সে আমার খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

থানবী (রহ.)-কে যদি কেউ বলতো, হযরত! ওজিফা ছুটে গেছে; ঠিক মতো আদায় করতে পারিনি। তখন হযরত বলতেন, তাওবা কর, তারপর পুনরায় শুরু কর। ভবিষ্যতে যথাযথভাবে পালনের প্রতিজ্ঞা কর। ওজিফা ছোটার

কারণে তিনি কখনও কারো খেলাফত কাটেন নি। কিন্তু হালাল-হারামের চিন্তা না করার কারণে খেলাফত কেটে দিয়েছেন। কারণ, যার মধ্যে হালাল-হারামের ভেদাভেদ নেই, সে তো সত্যিকারের মানুষই নয়। এজন্যই তো আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন–

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ –

'হালাল অন্বেষণ করা ফরযসমূহের পর একটি ফরজ।'

হারাম হালালকে নষ্ট করে দেয়

বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, হালালের সাথে হারামের সংমিশ্রণ ঘটলে হালালটা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ– তখন হালালের বরকত চলে যায়। এজন্য প্রত্যেক নিজস্ব অবস্থান থেকে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের মাঝে এ ফিক্‌র দান করুন। আমীন।

রিযিক অন্বেষণ জীবনের লক্ষ্য নয়

তৃতীয় আরেকটি বিষয় হলো, আলোচ্য হাদীসে যেমনিভাবে হালাল রিযিক অন্বেষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে হালাল রিযিক অন্বেষণের স্তরও উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের বিশ্বে মানুষ অর্থ উপার্জন করাকে নিজের মূল লক্ষ্য হিসাবে বানিয়ে নিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের জীবন অর্থের নেশায় কেটে যায়। সকলের একটাই ভাবনা– উপার্জনের অংক কিভাবে বাড়াবো। কিভাবে জীবনযাত্রার মান আরো প্রাচুর্যময় করবো। অর্থাৎ– আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্যই যেন অর্থ উপার্জন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব কতটুকু, সেটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, জীবিকা উপার্জন মানুষের প্রয়োজন মাত্র; মূল লক্ষ্য নয়। এ প্রয়োজনের খাতিরে তিনি জীবিকা উপার্জনের অনুমতির পাশাপাশি আমাদেরকে উৎসাহিতও করেছেন। তবে সাথে-সাথে এও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মানবজীবনের মূল লক্ষ্য ইবাদত-বন্দেগী; জীবিকা উপার্জন নয়।

সুতরাং কোথাও যদি জীবিকা উপার্জন এবং ফরয পালনের মাঝে সংঘাত দেখা দেয়, তাহলে ফরযকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অনেকে এক্ষেত্রে চরম ভুল করে বসে। তারা হালাল-জীবিকা উপার্জন দ্বীনের অংশ মনে করে এর পেছনে এমনভাবে ছুটেছে যে, নামায-রোযাকে পর্যন্ত দূরে ঠেলে দিয়েছে। এদেরকে

নামায পড়ার কথা বলা হলে চট করে উত্তর দিয়ে দেয়, আমি যে কাজ করছি, সেটাও তো দ্বীনেরই অংশ। মূলত এটা তাদের মূর্খতা। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, জীবিকা উপার্জন দ্বীনের প্রথম পর্যায়ের পর একটি ফরয। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের ফরযের সাথে জীবিকা উপার্জনের সংঘাত হলে প্রাধান্য দিতে হবে প্রথম পর্যায়ের ফরযকেই।

এক কামারের গল্প

গল্পটি শুনেছি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) থেকে। পৃথিবীখ্যাত ইমাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর গল্প। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সুফি। বড় মাপের আলেম হিসাবে তিনি সমকালীন আলেমদের চোখে খুব শ্রদ্ধাযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হতেন। তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন ওই যুগের এক বুযুর্গ তাঁকে স্বপ্ন দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে সীমাহীন দয়া করেছেন। তবে কথা হলো, আমার বাড়ির সামনে ছিলো এক কামারের বাড়ি। তাকে আল্লাহ তা'আলা আমার চাইতে উঁচু মাকাম দান করেছেন।

ঘুম ভাঙ্গার পর ওই বুযুর্গ ভাবলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের চাইতে অধিক মর্যাদাবান যে কামার, তার সম্পর্কে একটু জানা দরকার। সে এমন কী আমল করতো, যার কারণে সে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককেও ছাড়িয়ে গেছে। অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের বাড়িতে গেলেন। খোঁজখবর নিলেন। জানতে পারলেন, বাস্তবেই তাঁর বাড়ির সামনে এক কামার বাস করতো। সেও মারা গিয়েছে। বুযুর্গ কামারের ঘরে পৌঁছলেন এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী দুনিয়াতে কী কাজ করতো? স্ত্রী উত্তর দিলো, আমার স্বামী তো ছিলো একজন সাধারণ কামার। সারাদিন লোহা পেটানোই ছিলো তার কাজ।

বুযুর্গ বললেন, না, তোমার স্বামী নিশ্চয় বিশেষ কোনো আমল করতো। যে কারণে আমি স্বপ্নে দেখেছি তার মর্যাদা এখন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

স্ত্রী বললো, আমার জানামতে তো আমার স্বামী সারাদিন লোহা পেটাতেন। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমাদের বাড়ির সামনেই আবদুল্লাহ ইবনে

মুবারকের বাড়ি। রাতে তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে উঠে এমনভাবে তাহাজ্জুদে ডুবে থাকতেন যে, দূর থেকে মনে হতো একটি স্থির কাঠের টুকরা। তিনি কোনোরূপ নড়াচড়া করতেন না। আমার স্বামী ঘুম থেকে উঠলেই এ দৃশ্য দেখতে পেতেন। তখন তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, আহ, আল্লাহ তাঁকে সুযোগ দান করেছেন। তিনি রাতভর কত সুন্দর ইবাদত করছেন। মনে ঈর্ষা জাগে, আল্লাহ যদি আমাকে আমার পেশা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে এমন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতেন, তাহলে আমিও তাঁর মতো রাতভর তাহাজ্জুদ পড়তাম।

আমি আমার স্বামীকে সব সময় এভাবে আক্ষেপ করতে দেখতাম।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমার স্বামী লোহার কাজ করতো। এরই মধ্যে যখনই আজানের ধ্বনি কানে আসতো, তখন তিনি উঁচু করা হাতুড়িটা দ্বারা আরেকবার লোহাতে আঘাত করা পছন্দ করতেন না। বরং হাতুড়িটি উপর থেকে পেছনের দিকে ফেলে দিয়ে বলতেন, কানে আযানের ধ্বনি আসার পর হাতুড়ি চালানো আমার জন্য বৈধ নয়। একথা বলে সোজা মসজিদে রওয়ানা হয়ে যেতেন।

স্বপ্নদ্রষ্টা বুযুর্গ এ বৃত্তান্ত শুনে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, এ কারণেই আল্লাহ তাঁকে এত সুমহান মর্যাদার অধিকারী করেছেন।

দেখুন, একজন কামার হালাল জীবিকা অন্বেষণে তার কোনো অবহেলা নেই। কিন্তু আযানের শব্দ কানে আসার সাথে-সাথে হাতুড়ি ফেলে মসজিদে চলে যাচ্ছে। জীবিকার উপর নামাযকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এটাই ইসলামের মূলনীতি।

একটি সারগর্ভ দু'আ

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَهَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغْ عِلْمِنَا وَلاَ غَايَةَ رُغْبِنَا –

(ترمذی ، كتاب الدعوات، رقم الحديث : ٣٥٦٩)

'হে আল্লাহ! দুনিয়াটা আমার চিন্তার প্রধানকেন্দ্র, আমার জ্ঞানের মূল উৎস ও আমার আকর্ষণের মূল লক্ষ্যবিন্দু বানিও না।'

এর মর্ম হলো, আমার চিন্তা-চেতনায় যেন দুনিয়া জেঁকে না বসে। অর্থ-বৈভবই যেন আমার জ্ঞান ও মেধাচর্চার মূল ক্ষেত্রস্থল না হয় এবং পার্থিব লোভ-লাভ যেন আমার মূল কামনা-বাসনা না হয়।

সারকথা

হাদীসটি থেকে আমরা তিনটি শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

১. হালাল উপার্জন দ্বীনের অংশ।

২. হালাল উপার্জনের পাশাপাশি হারাম থেকে বাঁচারও চেষ্টা করতে হবে।

৩. হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রেও শরীয়তের সীমা মেনে চলতে হবে।

অর্থাৎ জীবিকা উপার্জনকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দয়া করে এ বিষয়গুলো বোঝার এবং এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

গুনাহের অপবাদ থেকে আত্মরক্ষা

'পাপের কিছু পরিচিত স্পট আছে। যেমন— সিনেমা হল। আপনি কোথাও যাচ্ছেন। ভাবলেন, সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যে-পথটা আছে সেটা যেহেতু সংক্ষিপ্ত, তাই ওই পথ দিয়েই যাবো। সিনেমার ছবি দেখার ইচ্ছা আপনার মনের বারান্দাতেও ছিলোনা। আপনি সেপথ দিয়েই গেলেন। আপনার পরিচিত কেউ আপনাকে পথটি মাড়াতে দেখেছে। এতে আপনার প্রতি কুধারণা তার মনে তৈরি হয়েছে। বলুন, এ কুধারণার গুনাহের সে কেন জড়ালো? আপনার কারণেই তো। সুতরাং এরূপ জায়গা থেকেও নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা চাই।"

গুনাহের অপবাদ থেকে আত্মরক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوْرُهُ فِيْ اِعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ – الخ

(صحيح بخارى ، كتاب الاعتكاف ، باب هل يخرج المعتكف لحوا ئجه الى باب المسجد

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হাদীসের সার

সুদীর্ঘ হাদীস, যেখানে স্থান পেয়েছে নবী-জীবনের একটি ঘটনা। হাদীসটির খোলাসা এই- রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে ইতেকাফ করতেন প্রতি রামাযানে। একবার তিনি ইতেকাফে ছিলেন। এরই মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.) মসজিদে চলে এলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দেখা করতে। যেহেতু ইতেকাফে থাকার কারণে নবীজী (সা.) ঘরে যেতে পারছিলেন না, তাই হযরত সাফিয়্যা (রা.) নিজেই চলে এলেন মসজিদে। এসে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর যখন ফেরার সময় হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের দরজা পর্যন্ত এলেন।

দেখুন, আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকটি সুন্নাতের বিবরণ এসেছে। প্রথমত, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বামী যদি মসজিদে ইতেকাফে থাকেন, তাহলে স্ত্রী সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে তার সাথে দেখা করার জন্য মসজিদে আসতে পারবে। এটা জায়েয।

স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়া

দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর মর্যাদা প্রমাণিত হলো। দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত সাফিয়্যাকে ই'তেকাফস্থল থেকে বিদায় দেননি। বরং বিদায় দেয়ার জন্য তার সাথে দরজা পর্যন্ত এসেছেন। এটা করেছেন সাফিয়্যা (রা.) এর সম্মানার্থে। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিলেন যে, স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা উচিত এবং তাকে মর্যাদা দেয়া উচিত। এটা তার অধিকার। স্ত্রী দেখা করার জন্য মসজিদে এসেছেন আর অমনি স্বামী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে কিছুপথ এগিয়ে দেয়া।

অন্যের সন্দেহ পরিষ্কারভাবে দূর করা উচিত

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হলেন, দেখতে পেলেন, দুইজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য এদিকেই এগিয়ে আসছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাবলেন, এ দুইজন কাছে এলে তো উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া (রা.) এর সাথে দেখা হয়ে যাবে এবং পর্দা লজ্ঘিত হবে। তাই তিনি সাহাবীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ওখানেই একটু অপেক্ষা কর। এ নির্দেশ দিলেন যেন সাফিয়্যা (রা.) পর্দার সাথে নিজ ঘরে চলে যেতে পারেন। তারপর সাফিয়্যা (রা.) যখন নিরাপদে চলে গেলেন, তখন তিনি সাহাবীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার আসতে পার। সাহাবীদ্বয় যখন এলেন, তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওই মহিলাটি ছিলো সাফিয়্যা। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, এ কোনো পরনারী ছিলোনা বরং সে আমার স্ত্রী ছিলো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদ্বয়কে এও বলেছিলেন যে, আমি বিষয়টি তোমাদেরকে এজন্য স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, শয়তান যেন তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে না পারে। সে যেন তোমাদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে যে, কে ছিলো এই নারী। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট করে দিলেন, এ ছিলো সাফিয়্যা– আমার স্ত্রী।

ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে।

অপবাদক্ষেত্র থেকে নিজেকে বাঁচাও

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোনো সাহাবীর ব্যাপারে এটা তো কল্পনাও করা যায় না যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে এমনটি ভেবেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পরনারীর সাথে গিয়েছেন বলে তাদের অন্তরে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি–এটা সুনিশ্চিত। তাছাড়া মাস ছিলো রামাযানের মতো পবিত্র মাস। তাও আবার রামাযানের শেষ দশক। স্থান ছিলো মসজিদে নববীর মতো পবিত্র স্থান। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ই'তেকাফ অবস্থায়। এত পবিত্রতার বেষ্টনিতে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপারে দূরের কথা– কোনো সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারেও এরূপ কল্পনা করা দুষ্কর।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত ঘটনার মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দিলেন– নিজেকে অপবাদক্ষেত্র থেকে দূরে রাখতে হবে। যদি কোথাও নিজের উপর দোষ এসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। যদি কেউ কোনো মন্দ ব্যাপারে আপনাকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে সম্ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উক্ত হাদীসের আলোকে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে। তাহলো–

اتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهَمِ

অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক।

যদিও প্রবাদটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস হিসাবে চালানো হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এটা হাদীস নয় বরং প্রবাদ। তবে এ প্রবাদের মূলে রয়েছে আলোচ্য হাদীস। সুতরাং যেমনিভাবে নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা জরুরী, অনুরূপভাবে জরুরী হলো নিজেকে গুনাহের অপবাদ থেকে রক্ষা করা।

অপবাদক্ষেত্র থেকে বাঁচার দুটি উপকারিতা

অপবাদক্ষেত্র থেকে নিজেকে বাঁচানোর মাঝে দুটি ফায়দা রয়েছে–

প্রথমত, নিজের উপর নিজের একটা হক আছে। যেমনিভাবে নিজের উপর অপরের কিছু হক আছে। আর নিজের উপর নিজের হক হলো, বিনা কারণে নিজেকে অপমানিত না করা। আর নিজের উপর অপবাদ আসা মানেই তো নিজে অপমানিত হওয়া। তাই নিজের উপর যেন অপবাদ না আসে, এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এতে অপর ব্যক্তির ফায়দা রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি আপনাকে দেখে কুধারণা করবে–এতে সে অযথা কুধারণার গুনাহে লিপ্ত হবে। আর তার এ গুনাহের কারণ তখন আপনিই হবেন। সুতরাং অপরকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে অপবাদের ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখতে হবে।

পাপস্থল থেকে বেঁচে থাকা চাই

পাপের কিছু পরিচিত জায়গা আছে। যেমন সিনেমা হল। আপনি কোথাও যাচ্ছেন। ভাবলেন, সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যে-পথটা আছে, সেটা যেহেতু সংক্ষিপ্ত, তাই আমি ওই পথ দিয়ে যাবো। এক্ষেত্রে সিমেনার ছবি দেখার নিয়ত আপনার মনের বারান্দাতেও নেই। তাই সেই পথ দিয়েই গেলেন। আর আপনার পরিচিত কেউ আপনাকে সেই পথ মাড়াতে দেখেছে। এতে আপনার প্রতি তার মনে একটা কুধারণা তৈরি হয়েছে। বলুন, এ কুধারণার গুনাহ সে কেন করলো? আপনার কারণেই তো। সুতরাং এরূপ জায়গা থেকেও নিজেকে নিরাপদ রাখা চাই।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত

বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। একদিকে যেমনিভাবে নিজেকে মুত্তাকী হিসাবে প্রকাশ করা যায় না, তেমনিভাবে অপরদিকে নিজেকে গুনাহগার হিসাবেও প্রকাশ করা যায় না। নিজেকে গুনাহগার হিসাবে জাহির করা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতও নয়। বরং তাঁর সুন্নাত হলো নিজেকে গুনাহর অপবাদ থেকে দূরে রাখা।

মালামতি ফেরকা

'মালামতি ফেরকা' নামে একটি ভ্রান্ত দল ছিলো। এরা নিজেদেরকে মালামতি নামে পরিচয় দিয়ে বেড়াতো। এদের কাজ ছিলো, নিজেদেরকে তারা পাপাচারীর মতো করে সাজিয়ে রাখতো। যেমন–নামাযের জামাতে শরীক হতোনা। কারো সামনে যিক্র-ইবাদত করতো না। বরং নিজেদেরকে তারা পাপাচারী হিসাবে প্রকাশ করতো। বেশ-ভূষাও এভাবেই ধারণ করত। তাদের যুক্তি ছিলো, দাড়ি রাখলে, মসজিদে গেলে কিংবা যিক্র-ইবাদত করলে মানুষ আমাদেরকে সমীহ করে চলবে। এতে অন্তরে রিয়া ও অহংকার তৈরি হবে। সুতরাং ইবাদত করবো গোপনে আর বাহ্যিক সূরতে নিজেকে পাপিষ্ঠের মতো করে রাখবো। যাতে মানুষ সমীহ না করে বরং ঘৃণা করে। মূলত মালামতি

ফেরকা ছিলো একটি ভ্রান্ত ফেরকা। কারণ, এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত নয়। শরীয়তের তরিকাও নয়। বুযুর্গানে দ্বীনও এ পদ্ধতিকে সহীহ বলেননি।

এক গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি গুনাহ কর

হতে পারে কোনো আল্লাহর বান্দা বিশেষ অবস্থায় পড়ে এমনটি করেছেন। কিন্তু সে অনুসরণযোগ্য নয় মোটেও। কেননা, তার এ জীবনাচার শরীয়তসিদ্ধ ও ইসলাম-সমর্থিত নয়। এক গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য, যেমন রিয়া ও তাকাব্বুর থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি ইসলাম কখনও দেয় না। জামাতে শরীক না হওয়া, দাড়ি কাটা এগুলোও তো গুনাহ। আল্লাহ যাকে গুনাহ বলেছেন, সেটাই গুনাহ। সুতরাং এক গুনাহকে ছাড়ার জন্য আরেকটি গুনাহ করা যাবে না।

নামায মসজিদে পড়তে হবে

মনে রাখবেন, এসবই শয়তানের ধোঁকা। আল্লাহ যেহেতু মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার জন্য বলেছেন, সুতরাং নামায পড়তে হবে মসজিদেই। এটা রিয়া হবে মনে করা যাবে না। রিয়া হলে সাথে-সাথে ইস্তেগফার করবে। কিন্তু মসজিদে যাওয়া বন্ধ করা যাবেনা। ফরযসমূহের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ হলো, ফরযসমূহ আদায় করতে হয় প্রকাশ্যে। তবে নফল ঘরে পড়ার অনুমতি আছে। সুতরাং পুরুষদেরকে নামায আদায় করতে হবে জামাতের সাথে।

নিজের উযর প্রকাশ করে দিন

মনে করুন, আপনি কোনো উযরের কারণে মসজিদে নামায পড়তে পারলেন না। ঠিক ওই সময়ে আপনার কাছে কোনো মেহমান এলো। আপনার ধারণা হলো, এ মেহমান আপনার জামাতে অনুপস্থিতির ব্যাপারে খারাপ কিছু ভাবতে পারে। তাহলে আপনি কেন জামাতে যাননি তা মেহমানকে জানিয়ে দিন। এটা কোনো গুনাহের কথা নয়। বরং এটাই সুন্নাত। অপবাদস্থল থেকে বাঁচার পদ্ধতি এটাই। এটা রিয়া হবে না।

হযরত থানবী (রহ.) এর ভাষায় আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত থানবী (রহ.) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, এমন সংশয়ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গুনাহ, অথচ মূলত গুনাহ নয়। যেমন-নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সাথে বসা এবং

পরনারীর সাথে বসা উভয়টা বাহ্যত একই রকম। এমন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা জরুরী। তাই স্পষ্ট করে দেয়া জরুরী যে, এ পরনারী নয় বরং আমার স্ত্রী।

নেক কাজের মাঝে অপব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই

যেমন–কেউ একটি সুন্নাত পালন করলো। কিন্তু ওই সুন্নাতটিকে মানুষ অন্যভাবে দেখে। যেমন– কেউ দাড়ি রাখলো। মানুষ এ দাড়িকে পছন্দ করেনা। এখন যে দাড়ি রেখেছে– সে লজ্জাবোধ করছে। তাই সে এর একটা ব্যাখ্যা তৈরি করে নিয়েছে এবং সেটা মানুষের কাছে বলে বেড়াচ্ছে। মনে রাখবেন, এ ধরনের অপব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন নেই। কেননা, দাড়ি রাখা তো এমন কাজ, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি নির্দেশও। সুতরাং মানুষ একে যা-ই মনে করুক তাতে আপনার কী। মানুষ প্রশংসা করলো, না আড়চোখে তাকালো, তাতে আপনার কিছু যায়-আসে না। নিন্দা তো একজন মুসলমানের জন্য গলার মালা। যদি দ্বীনের উপর চলার কারণে কেউ আপনাকে নিন্দাবাদ করে, তাহলে একে মোবারকবাদ মনে করুন। কেননা, এটা আম্বিয়ায়ে কেরামের মীরাছ, যা আপনি এখন পাচ্ছেন।

সুতরাং ঘাবড়াবেন না। বরং সামনে এগিয়ে চলুন। দ্বীনের উপর অটল থাকুন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আজকের আলোচনার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

বড়কে সম্মান করা

"মুসলমানকে সম্মান করা মানে প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়ে প্রোথিত ঈমানের মর্যাদা দেয়া। একজন মুসলমানের হৃদয়ে যেহেতু ঈমানের মতো মহান দৌলত আছে সুতরাং সে সম্মানের পাত্র অবশ্যই। কেননা, ঈমানের মর্যাদার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে।"

বড়কে সম্মান করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ -

(ابن ماجه ، كتاب الادب، باب اذا تاكم كريم قوم فاكرموه، حديث نمبر ٣٧١٢)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হাদীসের অর্থ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে কোনো জাতির সম্মানিত ব্যক্তি আসবে, তখন তোমরা তার সম্মান করবে।

ইকরাম

ইকরাম মানে মর্যাদা দেয়া। ইসলামের নির্দেশ হলো, প্রত্যেক মুসলমানকেই ইকরাম করতে হবে। এটা এক মুসলমানের কাছে আরেক মুসলমানের পাওয়া। এ পাওনা আদায় করতে হবে। এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে, যদি তুমি কোথাও বসা থাক আর এমতাবস্থায় তোমার কাছে কোনো মুসলমান আসে, তাহলে তুমি কমপক্ষে এদিক-সেদিক নড়েচড়ে বোঝাও যে, আমি আপনাকে

মর্যাদা দিচ্ছি। মূর্তি কিংবা পাথরের মতো নির্জীব বসে থাকলে তা হবে ইকরাম পরিপন্থী। এটা হবে অভদ্র আচরণ।

দাঁড়িয়ে সম্মান করা

দাঁড়িয়ে সম্মান করার একটা রীতি আমাদের সমাজে আছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, আগন্তুক যদি চায় যে, তার আগমনে আপনি দাঁড়াবেন এবং এভাবেই তাকে সম্মান জানাবেন, তাহলে দাঁড়িয়ে সম্মান করা নাজায়েয। কেননা, আগন্তুকের এ চাওয়াটা অহংকারের আলামত। এতে সে বোঝাতে চাইছে, আমি বড়– অন্যরা আমার ছোট। সুতরাং এমন অহংকারীর সম্মানে দাঁড়ানো যাবে না। পক্ষান্তরে আগন্তুকের অন্তরে যদি এ জাতীয় কোনো চাওয়া-পাওয়া না থাকে, তাহলে তার ইল্‌ম বা তাক্‌ওয়া কিংবা পদমর্যাদার কথা বিবেচনা করে তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো যাবে। এতে কোনো গুনাহ হবে না। তবে দাঁড়ানোকে জরুরীও মনে করা যাবে না।

হাদীস থেকে প্রমাণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই সাহাবায়ে কেরামকে ক্ষেত্রবিশেষে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– বনু কুরাইজার ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তিনি হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডাক পেয়ে যখন সা'দ (রা.) আসছিলেন তখন বনু কুরাইজাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন–

قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের নেতা আসছেন। তাই তার সৌজন্যে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষেত্রবিশেষ সম্মানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো যাবে। তবে এটা জরুরী নয়। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই জরুরী যে, আগন্তুকের সৌজন্যে একটু নড়েচড়ে বসা, যেন সে বুঝতে পারে আপনি তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুসলমানকে সম্মান করার অর্থ ঈমানকে সম্মান করা

কোনো মুসলমানকে সম্মান করা মানে প্রকৃতপক্ষে ঈমানকে মর্যাদা দেয়া, যে ঈমান ওই মুসলমানের হৃদয়ে গেঁথে আছে। একজন মুসলমানের হৃদয়ে যেহেতু ঈমানের মতো মহান দৌলত আছে সুতরাং সে অবশ্যই সম্মান পাওয়ার

যোগ্য পাত্র। তার বাহ্যিক বেশ ও আমল যেমনই হোক যেহেতু সে ঈমানদার তাই সে সম্মানের পাত্র অবশ্যই। কেননা, ঈমানের মর্যাদা কতটুকু তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

এক যুবকের ঘটনা

একবারের ঘটনা। আমি দারুল উলূমের অফিসকক্ষে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে এক যুবক এলো। যুবকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইসলামের কোনো ছোঁয়া নেই। বাহ্যত সে একজন ইংরেজ। দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তার মধ্যে দ্বীনদারির লেশমাত্র আছে। সে আমার কাছেই এসেছে। বললো, আমি একটি মাসআলা জানতে এসেছি। আমি বললাম, কী মাসআলা? সে বললো, আমি একজন এ্যাকচুয়ারী। (ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলোর প্রিমিয়াম হিসাবের দেখভাল করার জন্য যে কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়, তাকে এ্যাকচুয়ারী বলা হয়। ওই সময়ে গোটা পাকিস্তানের কোনো বিদ্যালয়ে এ সাবজেক্ট ছিলো না। তাই সে বললো, এ বিদ্যা আমি ইংল্যান্ড থেকে শিখে এসেছি। ওই সময় গোটা পাকিস্তানে এ্যাকচুয়ারী ছিলো দু'-একজন। আর একজন এ্যাকচুয়ারীর জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে চাকুরী করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকেনা। সে বললো, পাকিস্তানে এসে আমি একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি নিয়েছি। যেহেতু এদেশে এ কাজের লোক নেই, তাই আমার বেতন অনেক। এজন্যই আমি চাকরিটা করছি। কিন্তু একজন আমাকে বললো, চাকরিটা হারাম। এখন আপনি আমাকে বলুন, ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করা জায়েয আছে কিনা?

আমি তাকে বললাম, বর্তমানে যেসব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী আছে, সেগুলো হয়ত সুদনির্ভর কিংবা জুয়ানির্ভর। আর সুদ-জুয়া যেহেতু হারাম, তাই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করাও হারাম। (উল্লেখ্য, কেউ যদি এ ধরনের কোনো ইনস্যুরেন্সে চাকুরি করে, তাহলে তার করণীয় হলো, সে অন্য কোনো বৈধ উপায় খুঁজতে থাকবে। একজন বেকার যেভাবে চাকুরি খুঁজে বেড়ায় ঠিক এরূপ গুরুত্বসহ তাকে জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো পথ খুঁজতে হবে। তারপর বৈধ উপায় পেয়ে গেলে হারাম উপায় ছেড়ে দিতে হবে। বুযুর্গগণ এ পরামর্শ এজন্য দিয়েছেন। কেননা, কার অবস্থা কেমন তাতো জানা নেই। এমনও তো হতে পারে যে, এ চাকরির উপর তার গোটা পরিবার নির্ভরশীল। এখন সে যদি হালাল চাকুরি পাওয়ার আগেই তার বর্তমান চাকরি ছেড়ে দেয়, তাহলে শয়তান তাকে এ ধোঁকায় জড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে যে, তার ধারণা তৈরি হবে দ্বীনের উপর চলা খুব কঠিন। দ্বীনের উপর চলতে গিয়েই আমার এত বিপদ।)

আমার উত্তর শুনে যুবক বললো, মাওলানা সাহেব! আমি চাকরি ছাড়বো কি ছাড়বো না এ পরামর্শ নিতে আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি শুধু জানতে এসেছি, আমার চাকরিটা হালাল, না হারাম? এবার আমি, তাকে বললাম, হালাল না হারাম এর উত্তর তো আমি দিয়েছি। পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে বুযুর্গদের কাছ থেকে যা শুনেছি, তাও আপনাকে শুনিয়ে দিলাম। যুবক বললো, আপনার পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে পরিষ্কারভাবে একশব্দে বলুন যে, হালাল, না হারাম? আমি বললাম, হারাম। যুবক বললো, আল্লাহ্ হারাম করেছেন না আপনি হারাম মনে করছেন? আমি বললাম, আল্লাহ হারাম করেছেন। এবার যুবক বললো, যে আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন, তিনি আমাকে হালাল রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না। সুতরাং আজ থেকে আমি অফিসে যাবো না। আমার চাকরিটা আমি এক্ষুণি ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর কাছে তো রিযিকের অভাব পড়েনি।

সূরত দেখে মন্তব্য করোনা

দেখুন, যুবকটিকে দেখে মনে হয়নি যে তার হৃদয়ে ঈমানের শেকড় এত মজবুত এবং তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসার নেয়ামতে সে এতটা ধন্য। অথচ বাস্তবতা ছিলো, আল্লাহ তার হৃদয়ে ঈমান ও তাওয়াক্কুলের আলো দান করেছিলেন। তাই সত্যিই সে ওই দিনই চাকরি ছেড়ে দিলো। তারপর আল্লাহর তাকে খুব দিলেন। হালাল উপার্জনের বিকল্প পথ তাকে দান করলেন। সে এখন আমেরিকায়। এখনও ওই যুবকের উত্তর আমার অন্তরে গেঁথে আছে। এজন্যই বলি, বাহ্যিক দিক থেকে কারো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। কোনো মানুষকেই খাটো করে দেখা যাবে না। প্রত্যেক মুসলমানই ঈমানের কারণে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। হযরত শেখ সা'দী (রহ.) চমৎকার বলেছেন–

ہر بیشہ گماں مبر کہ خالی ست

شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

অর্থাৎ– এটা ভেবোনা যে প্রত্যেক জঙ্গলই বাঘমুক্ত। চিতা ও বাঘের গোপন সমাগম প্রত্যেক জঙ্গলেই থাকতে পারে।

কাফেরের সম্মান

তাই সাধারণ মুসলমানকেও মর্যাদা দেয়া ইসলামের বিধান। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে এও বলা হয়েছে যে, আগন্তুক যদি নিজ জাতির অভিজাত ব্যক্তি হয়,

তাহলে সে কাফের হলেও তাকে দেখতে হবে মর্যাদার চোখে। এটা ইসলামের চরিত্রপর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এ শিক্ষার সার হলো– ইজ্জতওয়ালাকে ইজ্জত দেয়া উচিত। এ সম্মান তার কুফরির কারণে নয়। কেননা, কুফরি তো ঘৃণ্য বস্তু। এ সম্মান এজন্য যে, সে নিজ জাতির কাছে সম্মান পায়। তার জাতি তাকে ইজ্জত দেয়। সে জাতির নেতা বা মর্যাদাবান ব্যক্তি। সুতরাং তোমাদের কাছে এলে ভদ্রতার খাতিরে তোমরাও তাকে সম্মান কর। এমন যেন না হয় যে, তোমরা তাকে ঘৃণা করলে। কেননা, এতে সে মনে কষ্ট পাবে। ফলে ইসলামের প্রতি একটা ঘৃণাবোধ তার অন্তরে দানা বেঁধে বসবে।

কাফেরের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণ

কাফেরদের সাথে ক্ষেত্রবিশেষে কোমল আচরণ করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'মুদারাত' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর কাছে কাফের নেতারা যখন আসতো, তখন তিনি অবমূল্যায়ন করেছেন বলে কল্পনাও তারা করতে পারতোনা। বরং তিনি তাদেরকে সমীহ করতেন, আপ্যায়ন করতেন এবং সম্মানের সাথে বসাতেন। আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনতেন। এটাই ছিলো তাঁর স্বভাব। সুতরাং এটাই সুন্নাত।

এক কাফেরের ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে, একবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তিকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলেন। বললেন, আয়েশা! এই যে লোকটি আসছে, সে একজন দুষ্টুলোক। গোত্রের লোকেরা তার অনিষ্টতাকে ভয় পায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কথা শেষ না হতেই লোকটি তাঁর কাছাকাছি চলে এলো। তিনি লোকটির সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর খুব খাতির- তোয়াজের সাথে কথাবার্তা বললেন। কথাবার্তা শেষে লোকটি যখন চলে গেলো, আয়েশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নিজেই তো বলেছেন, লোকটি নিজের গোত্রের মধ্যে সবচে দুষ্টুলোক। অথচ সে যখন এলো, আপনি কোমল আচরণ করলেন এবং তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনটি কেন করলেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, লোকটি নিজের গোত্রের মধ্যে সবচে ইতর লোক হলেও সে গোত্রের নেতা। তাই তার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য এত সমীহ করলাম।

এই গীবত জায়েয

আলোচ্য হাদীসে দুটি প্রশ্ন তৈরি হয়। প্রথমত লোকটিকে আসতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ব্যাপারে যে মন্তব্য করলেন এটা গীবত নয় কি? এর উত্তর হলো, মূলত এটা গীবত নয়। কেননা, কোনো ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে কাউকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তার গীবত করা জায়েয। সুতরাং বাহ্যত এটা গীবত হলেও মূলত গীবত নয়। যেমন– এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, তুমি অমুক থেকে দূরে থেকো, যেন তোমাকে সে ধোঁকায় ফেলতে না পারে। কিংবা সে যেন তোমাকে কষ্ট না দিতে পারে। সতর্ক করার উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তির গীবত করা নয়। বরং সে বাস্তবেই যেহেতু ধোঁকাবাজ এবং মানুষকে কষ্ট দেয়, তাই তার অনিষ্টতা থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচানোই এ সতর্কতার উদ্দেশ্য। তাহলে এটা দৃশ্যত গীবত হলেও প্রকৃতপক্ষে গীবত নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)-কে যা বলেছেন, তা গীবত হয়নি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো লোকটির ধোঁকা ও অনিষ্টতা থেকে আয়েশা (রা.) কে সতর্ক করে দেয়া।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিকে লোকটির ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করলেন, অপরদিকে তাকে ইজ্জত করলেন। এতে দৃশ্যত বোঝা যায়, তিনি সামনে একরকম আচরণ করেছেন আর পেছনে অন্যরকম করেছেন। এর উত্তর হলো, এই আচরণ করেছেন কে?

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই তো। যার প্রতিটি কাজই ছিল বৈধ এবং আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। বাড়াবাড়ি তাঁর কাছে ছিলোনা। প্রতিটি কাজ তিনি মাপমতো করতেন। সুতরাং সতর্ক করার উদ্দেশ্যে যেমনিভাবে তিনি লোকটির আসল পরিচয় আয়েশা (রা.) কে জানিয়ে দিলেন, অনুরূপভাবে ভালো আচরণ করে এ শিক্ষাও দিলেন যে, লোকটির আমাদের কাছে এসেছে মেহমান হয়ে। মেহমান হিসাবে সে ভালো আচরণ পাওয়ার পাত্র। এটা তার হক। কাজেই মেহমান যেমনই হোক তার হক তাকে দিতে হবে।

লোকটি খুব দুষ্ট

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমনিভাবে বলেছেন, লোকটি বড় দুষ্ট, তেমনিভাবে পরবর্তীতে এও বলেছেন, লোকটির অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান করলাম। এতে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দুষ্ট লোকের দুষ্টমি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাকে সমীহ করা জায়েয। কেননা, নিজের জান-মাল ও ইজ্জত বাঁচানো নিজের উপর নিজের হক। সুতরাং নিজের এ হকও পূরণ করতে হবে। এর জন্য দুষ্ট লোককেও সমীহ করা যাবে। তবে তা প্রয়োজন ও সীমার

ভেতরে থাকতে হবে। অপ্রয়োজনে কিংবা অতিরিক্ত মর্যাদা দুষ্টলোককে দেয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আদর্শের প্রতিটি অংশে রয়েছে এরূপ অসংখ্য শিক্ষা। তিনি এই একটি হাদীসের মাধ্যমে যেমনিভাবে গীবতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তেমনিভাবে এ জাতীয় মর্যাদা দান যে কুটিলতাভুক্ত নয় তাও বাতলে দিয়েছেন। স্পষ্ট করে দিয়েছেন, একজন মেহমান কাফের হোক কিংবা ফাসেক, মেহমান মেহমানই। সুতরাং মেহমানকে মর্যাদা দেয়া মুনাফেকি নয়।

স্যার সাইয়েদের একটি ঘটনা

ঘটনাটি শুনেছি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর কাছ থেকে। স্যার সাইয়েদ তো আর এখন জীবিত নেই, মারা গেছে সে। জানা নেই আল্লাহ তার সাথে কেমন আচরণ করেছেন। মূলত সে ইসলামী বোধ-বিশ্বাসের মাঝে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলো। জঘন্য টাইপের লোক ছিলো সে। কিন্তু জীবনের প্রথমদিকে সে বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবত পেয়েছিলো এবং আলেম হিসাবেও ভালো ছিলো। তাই তার আখলাক ছিলো প্রশংসনীয়। আব্বাজান বলেন, একবার সে নিজের ঘরে বসা ছিলো। তার সাথে ছিলো তার কিছু বন্ধু-বান্ধব। ইতোমধ্যে সে দেখতে পেলো, একজন লোক তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তার পরনে ভারতীয় পোশাক। কিন্তু সে হাউজের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর থলে থেকে জুব্বা, রুমাল ও আবার মাথায় যে চাক্কি পরে, তা বের করলো এবং ভারতীয় পোশাক খুলে সে এগুলো পরে নিলো। স্যার সাইয়েদ দূর থেকে সব লক্ষ্য করলো এবং বন্ধু-বান্ধবকে উদ্দেশ্য করে বললো, দেখো, লোকটি কিন্তু ভালো নয়, ভারতীয় পোশাক পরা ছিলো ভালো কথা। এখন আরবী পোশাক পরলো কেন? মনে হয় লোকটি আমার কাছে এসে নিজেকে আরব পরিচয় দেবে। তারপর টাকা-পয়সা কিছু চাইবে।

একটু পরেই লোকটি এসে স্যার সাইয়েদের বাড়ির কড়া নাড়লো। স্যার সাইয়েদ নিজেই দরজা খুলে দিলো এবং সম্মানের সাথে তাকে ভেতরে আসতে বললো। জিজ্ঞেস করলো, জনাব, কোত্থেকে এসেছেন? লোকটি উত্তর দিলো, আমি শাহ গোলাম আলী (রহ.) এর মুরিদ। উল্লেখ্য, শাহ গোলাম আলী (রহ.) ছিলেন সমকালের উঁচুস্তরের সূফী। তারপর লোকটি বলতে লাগলো, আমি একটা প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে কিছু সহযোগিতা করুন।

দেখা গেলো, স্যার সাইয়েদ এমনিতে তো লোকটির কথা আগ্রহভরে শুনলো, তারপর সে যা চেয়েছে তার চেয়ে বেশি সহযোগিতা করলো এবং সসম্মানে বিদায় দিলো।

লোকটি চলে যাওয়ার পর স্যার সাইয়েদের এক বন্ধু বললো, জনাব! আপনি তো দেখি আশ্চর্য মানুষ। নিজ চোখে দেখলেন লোকটি বহুরূপী। অথচ তাকেই এত তোয়াজ করলেন আবার টাকা-পয়সাও দিলেন!

স্যার সাইয়েদ উত্তর দিলো, সে ছিলো মেহমান। তাই তার যত্ন করেছি। আর টাকা দিয়েছি তার ধোঁকাবাজির কারণে নয়, বরং সে এমন এক বুযুর্গের দোহাই দিয়েছে, যার নাম শুনে আমি গলে গেছি। তাকে ফিরিয়ে দেয়ার সাহস করিনি। হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.) এমন এক ওলী ছিলেন, যদি তার সাথে কিঞ্চিত সম্পর্কের দোহাইও সে আমাকে দিতো, আমার উপর ফরয ছিলো তাকে খাতির করার। আল্লাহ হয়ত এ উসিলায় আমাকে মাফ করে দিবেন। তাই টাকা-পয়সাও তাকে দিলাম।

দ্বীনের নেসবতের ইহতেরাম

ঘটনাটি আমি আব্বাজানের মুখে শুনেছি। তিনি শুনেছেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর কাছে। থানবী (রহ.) এও বলেছিলেন, স্যার সাইয়েদ একদিকে মেহমানের সম্মান করলো, অপরদিকে বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে, তার মর্যাদা দিলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাধারণ জলসায় মাননীয় ব্যক্তির সম্মান

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আরয করছি। তাহলো, সাধারণ সভা কিংবা মাহফিল কিংবা মসজিদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যে-ব্যক্তি প্রথমে যেখানে বসবে, সে ওইখানের অধিক হকদার। যেমন–মসজিদের প্রথম কাতারে যে আগে বসবে, সে ওইখানের হকদার। সুতরাং কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই লোকটিকে তার জায়গা থেকে হটানো। বরং যেখানে জায়গা পাবে, সে ওইখানে বসে পড়বে। কিন্তু এ ধরনের সাধারণ মাহফিলে যদি সম্মানিত কেউ এসে পড়ে, তাহলে তাকে সামনে বসানোও এ হাদীসের মর্মভুক্ত। আমাদের বুযুর্গরাও এমনটি করতেন। সম্মানিত মেহমান এলে সামনে জায়গা করে দিতেন। প্রয়োজনে কাউকে পেছনে বসার জন্য বলতেন।

আলোচ্য হাদীসের উপর আমল হচ্ছে

বিষয়টা এজন্য পরিষ্কার করে দিলাম, যেন কোনো বুযুর্গকে এরূপ করতে দেখলে তাঁর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়। আমাদের বুযুর্গ মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.)কেও এভাবে করতে দেখেছি। এটা কারো উপর অবিচার নয়। বরং এভাবে আলোচ্য হাদীসের উপর আমল হয়ে যাচ্ছে।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফের হোক কিংবা ফাসেক যদি সে তোমার মেহমান হয়, তাহলে এ হাদীসের উপর আমল করার নিয়তে তাকে সম্মান করলে অবশ্যই সাওয়াব পাবে। কেননা, এখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের উপর আমল হবে। কিন্তু কেউ যদি এ নিয়ত করে যে, অমুককে সম্মান করলে সে আমার অমুক কাজে আসবে অথবা তার মাধ্যমে তদবির করানো যাবে এবং আমার অমুক স্বার্থ উদ্ধার হবে। অথচ সে ব্যক্তি কাফের কিংবা ফাসেক। তাহলে পার্থিব উদ্দেশ্য জড়িত হয়ে যাওয়ার কারণে তার কাজটি নাজায়েয হয়ে যাবে।

সুতরাং কাউকে মর্যাদা দেয়ার সময় নিয়ত সহীহ করা চাই। নিজের স্বার্থ নয়– বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুকুমের উপর আমলের নিয়ত করা চাই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

"কুরআন তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধভাবে হওয়া চাই। এটা পবিত্র কুরআনের প্রথম হক এবং কুরআন বোঝার প্রথম ধাপ। যার তেলাওয়াত শুদ্ধ নয়, তার জন্য দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। অনেকে অপপ্রচার করে থাকে, অর্থ ও মর্ম না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই, এতে কোনো অর্জন নেই। মনে রাখবেন, এটাও মূলত শয়তানের ধোঁকা। শয়তানের এ সূক্ষ্মজাল আজ সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিস্তার করা হচ্ছে।"

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهٖ اُوْلٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ○

(سورة البقرة ١٢١)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ – (بخارى ، فضائل القران، باب خيركم من تعلم القران وعلمه)

اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

সম্মানিত সুধী সমাজ!

একটি দ্বীনি মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। আমরা এতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে যাচ্ছি। মাদরাসা মানে কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমনি এক প্রতিষ্ঠানের প্রথম ইট আমরা স্থাপন করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ! এটা আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসাবে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে এর নূর ও বরকত দান করুন আমীন।

আয়াতের ব্যাখ্যা

স্থান-কাল বিবেচনা করে আমি কুরআন মজীদের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস পাঠ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِه أُوْلٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه ○

(سورة البقرة ١٢١)

অর্থাৎ– যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি। কিতাব মানে আল্লাহর কিতাব। তারা তেলাওয়াতের হক আদায় করে। মূলত তারাই এ কিতাবের উপর ঈমান আনে। অর্থাৎ কিতাবের উপর শুধু মৌখিক ঈমানই যথেষ্ট নয়। বরং এর তেলাওয়াতের হকও আদায় করতে হয়।

আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, কিতাবের উপর মৌখিক ঈমান আনার কথা তো সব ঈমানদারই বলে। কিন্তু এর তেলাওয়াতের হক আদায় না করলে তার ঈমানের এ দাবী প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়।

পবিত্র কুরআনের তিনটি হক

আমাদের উপর কুরআন মজীদের আল্লাহ প্রদত্ত কিছু হক রয়েছে। আলোচ্য আয়াত এটাই প্রমাণ করে। হকগুলো মূলত তিনটি। প্রথমত, কুরআন সহীহভাবে তেলাওয়াত করা। যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তেলাওয়াত করেছেন, সেভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়ত, কুরআন মজীদ বোঝার চেষ্টা করা। তার মাঝে যেসব তাৎপর্য ও রহস্য লুকায়িত আছে, সেগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করা। তৃতীয়ত, কুরআন মজীদের হিদায়াত ও

শিক্ষামালার উপর আমল করা। এ তিনটি হক আদায় করলে তাকে কুরআনের হক আদায়কারী হিসাবে ধরা হবে। কোনোটি অনাদায়ী থাকলে হক লঙ্ঘনকারী বলা হবে।

কুরআন তেলাওয়াত কাম্য

প্রথম হক হলো সহীহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা। অনেকে অপপ্রচার চালিয়ে থাকে, অর্থ ও মর্ম না বুঝে তোতা-ময়নার মতো কুরআন তেলাওয়াত করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই। বাচ্চাদের বুলির মতো শুধু তেলাওয়াতে কোনো অর্জন নেই। 'আল্লাহ মাফ করুন।' মনে রাখবেন, মূলত এটাও শয়তানের ধোঁকা। শয়তানের এ সূক্ষ্মজাল আজ সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিস্তার করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ পৃথিবীতে কেন পাঠানো হয়েছে? পবিত্র কুরআনে এর উত্তর একাধিকবার এসেছে। সেখানে দুটি উদ্দেশ্যকে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه

অনুরূপ বলা হয়েছে–

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থাৎ– তিনি এসেছেন, যেন আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে লোকজনকে শোনান এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন।

এখানে তেলাওয়াত পৃথক ও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য হিসাবে স্থান পেয়েছে। এতে নেকি ও সাওয়াব রয়েছে বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বুঝে পড়লেও সাওয়াব পাওয়া যাবে এবং না বুঝে পড়লেও সাওয়াব পাওয়া যাবে। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের প্রথম উদ্দেশ্য হিসাবে কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতে তাজবীদশাস্ত্র

উপরন্তু কুরআন তেলাওয়াত খেলনা নয়। যেমন মনে চায় তেমন তেলাওয়াত করা যাবে না। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে তেলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে হরফের উচ্চারণ শিখিয়েছেন। এরই ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের অস্তিত্ব আমরা পেয়েছি, যা দুনিয়ার অপরাপর জাতি পায়নি। একটি হলো তাজবীদশাস্ত্রে শিক্ষা দেয়া হয়েছে হরফের উচ্চারণ পদ্ধতি। হরফের উচ্চারণে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে

হয়, এ শাস্ত্রে সেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তেলাওয়াত করেছেন, এ শাস্ত্রে রয়েছে তার পরিষ্কার বিবরণ। ওলামায়ে কেরাম অক্লান্ত মেহনত করে এই শাস্ত্রের উপর অসংখ্য কিতাব লিখেছেন। হরফ উচ্চারণের কলাকৌশল শেখানোর নজির দুনিয়ার অন্য কোনো জাতির মাঝে নেই। এদিক থেকে এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য। তাই এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম মু'জিযাও। এই শাস্ত্র আজও উম্মতের কাছে অক্ষত অবস্থায় আছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তেলাওয়াত করেছেন, কুরআন মজীদ ঠিক সেভাবেই আমাদের কাছে আছে। কেউ এর মাঝে কোনো রদবদল করতে পারেনি।

ক্বিরাত শাস্ত্র

ক্বিরাতশাস্ত্র। কুরআন নাযিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, তেলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ আয়াত এভাবে এবং ওভাবে পড়ার সুযোগ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। একে বলা হয় ক্বিরাতশাস্ত্র। মুসলিম উম্মাহ এ শাস্ত্রের সংরক্ষণও পরিপূর্ণভাবে করেছে। আজও তা সংরক্ষিত আছে।

এটি প্রথম ধাপ

প্রতীয়মান হলো, তেলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। মনে রাখবেন, যার তেলাওয়াত সহীহ নয়, সে দ্বিতীয় ধাপে যেতে পারবে না। না বুঝে তেলাওয়াত করা প্রথম ধাপ। এ ধাপ অতিক্রম না করে দ্বিতীয় ধাপে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না।

প্রত্যেক হরফে দশ নেকি

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীর আমলনামায় প্রতি হরফের বিনিময়ে দশ নেকি লেখা হয়। তারপর তিনি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আমি বলিনা যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ। লাম একটি হরফ। মীম একটি হরফ। সুতরাং আলিম-লাম-মীম পড়ার সাথে-সাথে তার আমলনামায় ত্রিশটি নেকি যোগ হয়ে গেলো। কোনো-কোনো আলেম এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলিফ-লাম-মীম দ্বারা নব্বই নেকি লাভ হয়। কেননা, আলিফ লিখতে আরবী তিনটি হরফ লাগে। অনুরূপভাবে লাম লিখতে তিনটি হরফ এবং মীম লিখতে তিনটি হরফ লাগে। কাজেই নয় হরফ দ্বারা নব্বই নেকি পাওয়া যায়।

এত ফযীলত কুরআন মজীদের তেলাওয়াতে রয়েছে।

আখেরাতের নোট নেকিসমূহ

আমলনামায় নেকি-বৃদ্ধির গুরুত্ব আজ আমাদের অন্তরে নেই। অথচ কেউ যদি বলতো, আলিফ-লাম-মীম পড়লে নব্বই টাকা পাওয়া যাবে, তাহলে আমরা এর লাভালাভ অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতাম। মনে রাখবেন, এ নেকিগুলো তো আখেরাতের নোট। মানুষের চামড়ার চোখ যতদিন সচল থাকবে, যতদিন নিঃশ্বাস বাকি থাকবে, ততদিন এসব নেকির প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। চোখ বন্ধ হয়ে গেলে, নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেলে এবং আখেরাত ও বরযখের জগত শুরু হয়ে গেলে তখনই কাজে আসবে এই নোটগুলো। সেখানে দুনিয়ার নোট অচল হয়ে যাবে। সেখানকার জিজ্ঞাসা একটাই হবে, আমলনামায় কী পরিমাণে নেকি নিয়ে এসেছো? তখনই বোঝা যাবে এসব নেকির কত কদর।

কুরআন তেলাওয়াত আমরা ছেড়ে দিয়েছি

আফসোস, কুরআন তেলাওয়াত আমরা ছেড়ে বসেছি! একটা সময় ছিলো, যখন মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্য এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতো। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করতো, তারপর অন্যকাজে যেতো। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এই পরিবেশ মুসলমানদের মাঝে ছিলো। ঘরে-ঘরে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যেতো। অথচ আজ আর সেই পরিবেশ নেই। তেলাওয়াতের ধ্বনি দ্বারা বোঝা যেতো এটা মুসলমানদের পল্লি। কোথায় আজ সেই পরিবেশ? স্বাধীনতার স্বাদ আমরা হয়ত পেয়েছি। কুফ্র ও শির্‌ক থেকে আমরা স্বাধীন হয়েছি ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিধান থেকেও কি আমরা জীবনকে স্বাধীন করে নিই নি?

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। উৎসবের আমেজে চারিদিক ছেয়ে যায়। বিজয়ের পতাকা উড়ানো হয়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমরা ইংরেজ থেকে স্বাধীন হয়েছি। পাশাপাশি আল্লাহর দ্বীন থেকেও স্বাধীন হয়ে গেছি। ফলে আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুসহ সবকিছুই আজ হুমকির সম্মুখীন। পাপাচারের বাজার আজ উত্তপ্ত। গোটা জাতি আজ আযাবে তপড়াচ্ছে। আর আমরা এরই নাম দিয়েছি স্বাধীনতা। হায়রে স্বাধীনতা!

পবিত্র কুরআনের অভিশাপ থেকে বাঁচুন

কুরআন মজীদের তেলাওয়াত আজ উঠে গেছে। এ ক্ষেত্রে চলছে চরম দৈন্যতা। দু'একজন যদিও তেলাওয়াত করে; কিন্তু তাদের তেলাওয়াতে দেখা

যায় চরম উদাসীনতা। তারা তেলাওয়াতের হক আদায় করে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এক হাদীসে বলেছেন, মানুষ অনেক সময় এমনভাবে তেলাওয়াত করে যে, কুরআনের হরফগুলো তাকে অভিশাপ দেয়। কেননা, সে কুরআন মজীদকে বিগড়ে ফেলে। সহীহভাবে পড়েনা এবং এর জন্য চেষ্টাও সে করে না। এক ব্যক্তি আজ মুসলমান হলে তার এমন অক্ষমতা মাফ করা যেতে পারে। কেননা, সে মুসলমান হয়েছে আজ, সুতরাং সে সহীহ তেলাওয়াত পারবে কি করে? কিন্তু একজন মুসলমান যদি জীবনটাকেই এভাবে কাটিয়ে দেয়, সূরা ফাতেহাও সে শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে না পারে, তাহলে আল্লাহর সামনে কী জবাব দেবে? সুতরাং তেলাওয়াতের ব্যাপারে প্রত্যেককেই গুরুত্ব দেয়া চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে তেলাওয়াত করেছেন এবং উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন তেলাওয়াত ঠিক সেরকমই হওয়া চাই। সহীহ তেলাওয়াত কুরআনের প্রথম হক। যে লোকটি প্রথম হক আদায় করতে পারবে না, সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হক আদায় করবে কিভাবে?

এক সাহাবীর ঘটনা

একটি সময় ছিলো যখন মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের একেকটি আয়াত শেখার জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট ও কুরবানি পেশ করেছিলো। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একজন অল্পবয়সী সাহাবী আমর ইবনে সালামাহ (রা.)। তিনি বর্ণনা করেন, আমার বাড়ি ছিলো মদীনা থেকে বেশ দূরের একটি পল্লিতে। আমার গোত্রের কিছু লোক মুসলমান হয়েছিলো। আল্লাহ আমাকেও মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করেছিলেন। একজন মুসলমানের জীবনে কুরআনের চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই। তাই কুরআন শেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার পল্লিতে এর জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। মদীনায় গিয়ে শেখার মতো সুযোগও আমার ছিলো না। এজন্য আমি প্রতিদিন সেই রাস্তায় চলে যেতাম, যেখান দিয়ে মদীনার কাফেলা আসা-যাওয়া করতো। যখনই কোনো কাফেলার দেখা পেতাম, জিজ্ঞেস করতাম, ভাই! আপনারা কি মদীনা থেকে এসেছেন? পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত আপনাদের কারো জানা আছে কি? আমি কুরআন শিখতে চাই। যদি কারো জানা থাকে, তাহলে আমাকে শিখিয়ে দিন। কাফেলার কারো এক আয়াত, কারো দু'আয়াত, কারোবা তিন বা ততোধিক আয়াত মুখস্থ থাকতো। এভাবে কাফেলা থেকে এক-দু' আয়াত করে শিখতে-শিখতে 'আলহামদুলিল্লাহ' কুরআনের এক বিরাট অংশ আমি হেফজ করে নিয়েছি। এটা আমার প্রতিদিনের আমল ছিলো। মাত্র কয়েক মাসে আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বেশ কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে নিয়েছি। তারপর

আমাদের পল্লিতে মসজিদ হয়েছে। ইমামতির জন্য সবাই আমাকেই সামনে বাড়িয়ে দিলো। কেননা, পল্লির সকলের চেয়ে কুরআন আমার বেশি মুখস্থ।

এভাবেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে উম্মাহর আলোকিত সদস্যারা পবিত্র কুরআন আমাদেরকে উপহার দিয়েছে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআনের শুধু শব্দমালা নয়; বরং অর্থ ও তাৎপর্যও তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা আজ পাচ্ছি। আজ 'আলহামদুলিল্লাহ' পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, পবিত্র কুরআনের যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র যবান থেকে সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন হুবহু সে তাফসীরই আমাদের কাছে আছে। এতে কোনো সংযোজন ও বিয়োজনের ছুরি কেউ চালাতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে এর শব্দমালা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, অনুরূপভাবে এর তাফসীর সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন।

আরবী ভাষা সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি

আল্লাহ তাঁর এ কিতাবের অর্থ ও তাফসীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিভাবে করেছেন– এ সম্পর্কে ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি–

এক বুযুর্গ ও প্রসিদ্ধ আলেমের নাম আল্লামা হাসাবী (রহ.)। মু'জামুল বুলদান নামে তিনি একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। তাতে তিনি তাঁর যুগ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ শহরগুলোর বিভিন্ন অবস্থা ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন। যেটি ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়ে আসছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, জাযিরাতুল আরবে প্রসিদ্ধ দুটি গোত্র ছিলো। আক্কাদ ও যারায়েব গোত্র। তাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলো, তাদের গোত্রে কেউ তিন দিনের বেশি মেহমান হিসাবে থাকতে পারতো না। তিনদিন হলেই মেহমানকে তারা বিদায় দিয়ে দিতো। অথচ আরবরা খুবই অথিতিপরায়ণ হয়ে থাকে। অতিথির আগমনে তারা আনন্দিত হয়। এর বিপরীতে আক্কাদ ও যারায়েব গোত্রের এ জাতীয় আচরণের রহস্য কী? তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তারা বললো, আসলে বহিরাগত মানুষ আমাদের এখানে তিনদিনের বেশি থাকলে আমাদের ভাষা-সাহিত্যে এর প্রভাব পড়তে পারে। আগন্তুকের বলার ধরণ, উচ্চারণের স্টাইল ও ভাষায় অর্থ আমাদের ভাষাকে প্রভাবিত করতে পারে। এতে আমাদের ভাষায় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ আমাদের ভাষা হলো কুরআনের ভাষা। যে ভাষায় রয়েছে আরবি ভাষার সর্বোচ্চ লালিত্য ও কারুকার্য। তাই আমরা চাইনা আমাদের ভাষা আহত হোক। আমরা নিজেদের এ ভাষা অক্ষত রাখতে চাই। এ জন্য কোনো

আগন্তুককে আমরা আমাদের গোত্রে তিনদিনের বেশি অবস্থান করতে দেই না। এভাবেই আল্লাহ কুরআন মজীদের ভাষা ও মর্মার্থ সংরক্ষণ করেছেন।

কুরআন শিক্ষার জন্য চাঁদা আদায় : টাকা নয়– সন্তান

আজ কুরআন মজীদ মনোমুগ্ধকর আকারে আমরা পাচ্ছি। সর্বত্র কুরআন শিক্ষার আসর পাচ্ছি। মকতব পাচ্ছি। ওস্তাদ পাচ্ছি। মাদরাসা পাচ্ছি। এখানেও একটি মাদরাসা হতে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে জায়গাটি নেয়া হয়েছে। আমাদের কাজ হলো শুধু খাবারের লোকমার মতো মুখে নেয়া। সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শেখা এবং এর উপর আমল করা। তবুও আমরা তা পারছি না।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সময় চাঁদা করার একটা রেওয়াজ আছে। প্রসঙ্গটি সামনে এলেই আমার মনে পড়ে যায় আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) এর একটি কথা। তিনি বলতেন, মানুষ মাদরাসার জন্য চাঁদা তোলার প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ এটার খুব একটা গুরুত্ব আসলেই নেই। কেননা, আমার অভিজ্ঞতা হলো, ইখলাসের সাথে কাজ শুরু করলে আল্লাহ গায়েব থেকে সহযোগিতা করেন। দেখুন, বর্তমান বহু মাদরাসা এমন আছে–প্রয়োজনে আপনারা নিজ চোখে দেখে আসুন, সেসব মাদরাসায় কোনো চাঁদা নেই, কালেক্টর নেই। অথচ খুব সুন্দরভাবেই সেগুলো চলছে। আল্লাহ চালাচ্ছেন। আসলে ইখলাসই কাম্য। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য অবধারিত। তবে হ্যাঁ, মাদরাসার জন্য একটা চাঁদা প্রয়োজন। তাহলো, বাচ্চা-চাঁদা, ছাত্র-চাঁদা। প্রতিষ্ঠাতারা মাদরাসা করে দিলো, পয়সাও দিলো, বিল্ডিং হয়ে গেলো, পঠন-পাঠন শুরু হয়ে গেলো–এতসব আয়োজনের পরেও দেখা গেলো মুসলমানরা তাদের সন্তান দিতে চায়না। সন্তান মাদরাসায় পাঠালে নেকি পাওয়া যায় আর জাগতিক শিক্ষালয়ে পাঠালে টাকা কামানো যায়। নেকি বাকি, টাকা নগদ। তাই তারা বাকির আশায় নগদ ছাড়তে রাজি হয় না। বলুন, তাহলে মাদরাসা দ্বারা কী লাভ? এজন্য বলি, মাদরাসার জন্য টাকা নয়; বরং চাঁদা চাইতে হবে মুসলমানদের সন্তানের। মুসলিমদেরকে বলতে হবে, আমরা টাকা চাই না, চাই আপনাদের সন্তান।

বিল্ডিংয়ের নাম মাদরাসা নয়

সারকথা হলো, মাদরাসা বিল্ডিংকে বলা হয় না। জায়গা কিংবা প্লটের নামও মাদরাসা নয়। বরং মাদরাসা হলো ছাত্র ও ওস্তাদের নাম। দারুল উলূম দেওবন্দের নাম আপনারা অবশ্যই শুনেছেন। কত বিশাল মাদরাসা। কী ছিলো তার ইতিহাস? প্রতিষ্ঠানকালে তার জন্য কোনো জায়গা ছিলো না, বিল্ডিং

ছিলোনা। বরং একটি ডালিম গাছের নিচে একজন ওস্তাদ বসে গেলেন, একজন ছাত্র এসে গেলো এবং দরস-তাদরীস শুরু হয়ে গেলো। এভাবে প্রকাশ পেলো দারুল উলূম দেওবন্দ। এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত। এক খোলা চত্বরে তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মাদরাসা। এক 'সুফফা'য় এসে জমায়েত হয়ে গেলো সাহাবায়ে কেরামের মতো আলোকিত ছাত্ররা। এভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো একটি মহান মাদরাসার কার্যক্রম ও তৎপরতা।

এজন্যই আপনাদের কাছে আমার দরখাস্ত হলো, আপনারা এ মাদরাসাকে শুধু আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না; বরং পাশাপাশি চেষ্টা করবেন মানুষের হৃদয়ে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সৃষ্টি করার, যাতে মুসলমানরা যেন তাদের সন্তানদেরকে কুরআন শেখায়। তাছাড়া বড়দের মধ্যে যারা এখনও সহীহভাবে কুরআন পড়তে জানেন না, তারাও যেন কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন। এ কাজটি করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' মাদরাসা প্রতিষ্ঠা সফল হবে। আমরা আখেরাতে উপকৃত হবো।

আল্লাহ এই মাদরাসাকে কবূল করুন। এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের শ্রম ও চেষ্টা রয়েছে, তাদেরকেও কবুল করুন। এই মাদরাসাকে উত্তরোত্তর উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছিয়ে দিন। এই মাদরাসা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হওয়ার তাওফীক প্রত্যেক মুসলামানকে দান করুন। আমীন।

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মিথ্যা পরিচয় থেকে দূরে থাকুন

"মূলত ধর্মীয় কোনো পদমর্যাদার সাথে বংশমর্যাদার কোনো সম্পর্ক নেই। বংশমর্যাদায় যত তুচ্ছই হোক; কিন্তু ব্যক্তি যদি তাক্বওয়ার সাজে সজ্জিত হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে সে-ই প্রকৃত মর্যাদাবান। সে অভিজাত বংশের সদস্য না হয়েও অভিজাতদের চেয়ে অনেক দামী।"

মিথ্যা পরিচয় থেকে দূরে থাকুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ –

(ترمذى، كتاب البروالصلوة ، باب ماجاء فى المتشبع بما لم يعطه)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

সাহাবী জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেউ যদি নিজের বেশভূষায় এমন কিছু প্রকাশ করতে চায়, যা তার মধ্যে নেই, তাহলে সে ওই ব্যক্তির মতো, যে মিথ্যার দুটি কাপড় পরে আছে। অর্থাৎ– সে যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত মিথ্যার আবরণে লুকিয়ে আছে। পোশাক যেমনিভাবে মানুষের পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে, অনুরূপভাবে মিথ্যাও তাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রেখেছে।

এটাও মিথ্যা ও ধোঁকা

যেমন– আলেম নয় এমন ব্যক্তির নিজেকে আলেম হিসাবে প্রকাশ করা। পদের অধিকারী নয়, তবুও নিজেকে পদের মালিক হিসাবে জাহির করা। অমুক গোত্রের নয়, তবুও নিজেকে ওই গোত্রের লোক বলে পরিচয় দেয়া। এসবই

মিথ্যা ও ধোঁকা। এদের সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধানকারীর মতোই এরা। অনুরূপভাবে বাস্তবে ধনী নয়, অথচ নিজেকে ধনী হিসাবে তুলে ধরাও মিথ্যার শামিল।

নিজের নামের সাথে ফারুকী ও সিদ্দীকী লেখা

ফারুকী, সিদ্দীকী, আনসারী। এ জাতীয় পদবী লাগানোর হিড়িক বর্তমান সমাজে রয়েছে। অথচ সে বাস্তবে ফারুকী, সিদ্দীকী বা আনসারী নয়। এটাও মিথ্যা। এটাও কবিরা গুনাহ। এ ব্যাপারেই আলোচ্য হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে।

কাপড়ের সাথে তুলনা দেয়া হলো কেন?

আলোচ্য হাদীসে গুনাহটিকে মিথ্যার পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, পোশাকের সাথে তুলনা দেয়া হলো কেন? এর উত্তর হলো, মূলত পোশাক মানুষের জীবনে একটি সার্বক্ষণিক প্রয়োজন। তেমনিভাবে এ গুনাহটিও একটি সার্বক্ষণিক গুনাহ। মানুষ সব সময় পোশাক দ্বারা আবৃত থাকে। এ গুনাহটিও তাকে সবসময় ঘিরে ধরে রাখে। নিজে যা নয়, তা প্রকাশ করার অর্থ হলো নিজেকে অন্যরকমভাবে তুলে ধরা। এ 'অন্যরকম'টা তো ক্ষণিকের বিষয় নয়। তাই কিছু গুনাহ যে আছে ক্ষণিকের, এ গুনাহ তেমনটি নয়। বরং পোশাকের মতোই সার্বক্ষণিকভাবে সে একে এঁটে ধরে আছে। এজন্যই একে পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

তাঁতীরা আনসারী এবং কসাইরা কুরাইশী লেখা

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) শুধু এ বিষয়ে 'গায়াতুননসব' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিলো, যারা নিজেদের নামের সাথে এভাবে মিথ্যা 'সম্পর্ক' জুড়ে দেয়, তাদেরকে মিথ্যার গুনাহ থেকে বাঁচানো। এক সময় ভারতের তাঁতীরা নিজেদের নামের সাথে 'আনসারী' লিখতো। আর কসাইরা লিখতো 'কুরাইশী'। আব্বাজান এদের মনোযোগও আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস এনে তিনি তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, এটাও মিথ্যার শামিল। এতে তারা আব্বাজানের উপর প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে যায়। পুরো ভারতে তারা এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় করে। অথচ বাস্তবতা সেটাই, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন। তিনি তো বলেছেন এটা মিথ্যার শামিল।

বংশমর্যাদা বলতে কিছু নেই

মূলত ধর্মীয় কোনো পদমর্যাদার সাথে বংশমর্যাদার কোনো সম্পর্ক নেই। বংশমর্যাদায় যত তুচ্ছই হোক, কিন্তু ব্যক্তি যদি তাক্ওয়ার সাজে সজ্জিত হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে সে-ই প্রকৃত মর্যাদাবান। সে অভিজাত বংশের সদস্য না হয়েও অভিজাতদের চেয়েও অনেক শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ কুরআন মজীদে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ○ (سورة الحجرات ١٣)

হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পুরুষ হযরত আদম (আ.)। নারী হযরত হাওয়া (আ.)। সুতরাং সকল মানুষ এক মাতা-পিতার সন্তান। তবে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। তাই প্রত্যেকের জাতি ও গোত্র এক নয়। একেকজন একেক জাতি থেকে। একেকজন একেক গোত্র থেকে। যদি সকল মানুষ একই জাতের ও একই গোত্রের হতো, তাহলে পরস্পরকে চেনা কঠিন হয়ে যেতো। এখন তো চেনা সহজ হয়েছে যে, লোকটি অমুক এবং অমুক গোত্রের। শুধু এ পরিচিতি ও সনাক্তকরণ যেন সহজ হয়, তাই তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। সুতরাং জাতি ও বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে–গর্বের জন্য নয়। কেননা, কোনো জাতির উপর কোনো জাতির, বংশের উপর বংশের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা নেই। বরং তোমাদের মধ্য হতে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার। সুতরাং কে কোন বংশের এর প্রতি না তাকিয়ে নিজের আমল ও আখলাককে শুদ্ধ কর। তাক্ওয়ার ভিত্তিতে নিজের জীবনকে পরিচালিত কর। তাহলে তুমি পার্থিব অভিজাত পরিবারভুক্ত না হয়েও অনেক সামনে এগিয়ে যাবে। কেননা, কৌলিন্য ও অভিজাত্যের মাপকাঠি বংশ নয়। বরং এর মাপকাঠি হলো তাক্ওয়া। সুতরাং অভিজাত সাজার জন্য নিজের নামের সাথে ধার করা একটা পদবী জুড়ে দাও কেন? জুড়ে দেয়া পদবীর সাথে তোমার কী সম্পর্ক? মিথ্যা পদবী জুড়ে দিয়ে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি কর কেন? পদবী যদি লাগাতেই হয়, তাহলে সত্যটা লাগাও। অন্যেরটা নিয়ে অহেতুক টানাটানি কর কেন? এটা কঠিন গুনাহ। এ গুনাহ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

পালকপুত্রকে আসলপুত্র বলা

এ জাতীয় একটি মাসআলা নিয়ে পবিত্র কুরআনের প্রায় আধা রুকু' নাযিল হয়েছে। মাসআলাটি হলো, অনেক সময় মানুষ সন্তান দত্তক নেয়। যেমন–এক লোকের সন্তান নেই। তাই সে আরেকজনের একটি শিশুসন্তান এনে লালন-পালন করলো। এতে ইসলামের কোনো নিষেধ নেই। কিন্তু ইসলাম বলে, পালকসন্তান কখনও আসল সন্তান নয়। সুতরাং সন্তানটির পিতৃপরিচয় দিতে হলে তার আসল পিতার পরিচয় দিতে হবে। এ ছাড়াও আত্মীয়তার সকল বিধান সন্তানের আসল পিতার সাথে যুক্ত হবে। এমনকি যে-লোকটি পালক হিসাবে শিশুটিকে এনেছে, এর উসিলায় যে-মহিলাটি তাকে লালন-পালন করেছে, যদি সে গাইরে মাহরাম হয়, তাহলে শিশুটি বড় হওয়ার পর তার সাথে মহিলাটিকে পর্দা করতে হবে। যেমনিভাবে অন্যান্য পরনারীর সাথে সে পর্দা করবে। মোটকথা, মুখডাকা পিতা শুধু লালন-পালন করার কারণে আসল পিতা হয়ে যায় না। সুতরাং সন্তানটিকে তার দিকে নিসবত করাও মিথ্যার শামিল। যেমন–এভাবে বলা-এ আমার আসল সন্তান। কিংবা সন্তান নিজের পরিচয় এভাবে তুলে ধরা যে, অমুক আমার পিতা। উভয়টাই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর ঘটনা

সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পালকপুত্র। বিস্ময়কর এক ঘটনা তাঁর। জাহেলি যুগে ইনি ছিলেন একজন গোলাম। আল্লাহ তাঁকে মক্কাতে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন। অপরদিকে তাঁর মা-বাবা ও খান্দানের লোকেরা তাঁকে খুঁজে ফিরছিলেন– কোথায় গেলো আমাদের যায়েদ? এভাবে বেশ কয়েকটি বছর কেটে যায়। অবশেষে তারা সন্ধান পেলো, যায়েদ এখন মক্কায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে আছে। এ খবর শুনে তাঁর পিতা ও চাচা ছুটে এলো মক্কায়। সাক্ষাত করলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে। বললো, যায়েদ ইবনে হারেছা আমাদের সন্তান, এখন আপনার কাছে। অথচ আমরা তাঁর খোঁজে অস্থির হয়ে পড়েছি। আমরা তাকে নিয়ে যেতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আপনারা তার বাপ-চাচা। সে আপনাদের সাথে যেতে চাইলে আমার তো কোনো আপত্তি নেই। জিজ্ঞেস করুন, সে যাবে কিনা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা শুনে তারা খুব খুশি হয়ে গেলো। ভাবলো খুব সহজেই তারা সমাধান পেয়ে গেলো। আহা! আমাদের বেটা– আমাদের সন্তান। তাকে নিতে এসেছি দেখে কতইনা খুশি হবে সে। ওই সময়ে যায়েদ (রা.) ছিলেন হারাম শরীফে। তাই তারা উভয়ে চলে গেলো

ওখানে। অনেক দিন পর বাপ-চাচাকে দেখেছেন, তাই প্রথম সাক্ষাতে যায়েদ (রা.) খুশি হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু পিতা যখন বললো, আমার সাথে বাড়ি চলো, তখন তিনি উত্তর দিলেন, না আব্বাজান! আমি যাবোনা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন, আর আপনারা এখনও এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, আমি এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংস্পর্শ পাচ্ছি। এ সোহবত-সংস্পর্শ আমার কাছে খুবই প্রিয়। তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই।

পিতা তাকে বুঝালো, বেটা, এতদিন পর তোমাকে পেলাম; অথচ তোমার কত সংক্ষিপ্ত জবাব–তুমি যাবে না। দেখো, এ বুড়ো বাপের প্রতি একটু দয়া করো। যায়েদ (রা.) উত্তর দিলেন, পিতা হিসাবে আমার উপর আপনার কিছু চাওয়া-পাওয়া আছে। আমি সেগুলো পূরণ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আমার যে সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে, তা আমার জীবনও, আমার মরণও। এ সম্পর্ক ছিন্ন করলে আমার কলজে ছিঁড়ে যাবে। এ জন্যই আপনার সাথে আমি যাবোনা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়েদ (রা.)-এর উক্ত উত্তর শুনে ফেলেছেন। তাই তিনি তাঁকে বললেন, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা এত গভীর ও নিখাঁদ। ঠিক আছে, আজ থেকে তুমি আমার ছেলে। এ ঘটনার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়েদ (রা.) এর সাথে পিতা-পুত্রের মতো আচরণ করতেন। এরপর থেকে লোকজন যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সা.) বলে ডাকতে শুরু করে।

অর্থাৎ– মুহাম্মদ (সা.)-এর ছেলে যায়েদ। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন–

اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ○ (سورة الأحزاب ٥)

অর্থাৎ– তোমরা পালক সন্তানদেরকে এভাবে ডেকোনা; বরং তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক। আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ।

(সূরা আল-আহযাব : ৫)

অন্যত্র আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ○ (سورة الأحزاب ٤٠)

অর্থাৎ– মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। (সূরা আল-আহযাব : ৪০)

সুতরাং তাঁর পোষ্যপুত্রকে প্রকৃত পুত্র বলে পরিচয় দিয়োনা। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই মূলনীতি স্থির করে দিলেন যে, পোষ্যপুত্র কখনও প্রকৃত পুত্র নয়।

যায়েদ ইবনে (রা.) হারিছা (রা.)-এর মতোই সাহাবী হযরত সালেম (রা.)–যিনি ছিলেন হুযাইফা (রা.) এর আযাদকৃত গোলাম। তাঁকেও রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের পোষ্যপুত্র বানিয়েছিলেন। সাথে-সাথে এ নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন, যেহেতু এ আমার আসল ছেলে নয়, তাই তোমরা সালেম ইবনে মুহাম্মদ বলোনা। তাকে তার আসল পিতৃপরিচয়েই ডাকবে। আর সে আমার ঘরে প্রবেশ করবে পর্দার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

নিজের নামের সাথে মাওলানা লেখা

অনুরূপভাবে আলেম নয়, মাওলানা নয়, তবুও নিজের নামের সাথে 'মাওলানা' বা 'আল্লামা' শব্দ জুড়ে দেয়। এমন লোকও এ সমাজে আছে। অথচ এটাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মাওলানা বা আল্লামা তো প্রকৃতপক্ষে তাকেই বলা হয়, যিনি দরসে নেজামীর একটা স্তর খুব যত্নসহ শেষ করেন এবং বড় আলেম হন।

নামের সাথে প্রফেসর লেখা

প্রফেসর একটা সুনির্দিষ্ট পদের নাম। এ পদে পৌঁছুতে হলে কিছু নিয়মনীতি আছে। যে নিয়ম-নীতি পালন ছাড়া এ পদ পাওয়া যায় না। অথচ বর্তমানে এমন লোকও আছে, যে শিক্ষক হওয়ামাত্র নিজের নামের সাথে প্রফেসর লেখা শুরু করে। আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে এটাও নাজায়েয ও হারাম। কেননা, এটাও মিথ্যা।

ডাক্তার লেখা

ডাক্তার নয় তবুও অনেকে নিজেকে ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দেয়। কিছুদিন হয়তো কোনো ডাক্তারের কম্পাউন্ডারি করেছে আর এতেই নিজেকে ডাক্তার বলে বেড়াচ্ছে। এমনকি ক্লিনিকও খুলে বসেছে। এমন ব্যক্তি আলোচ্য হাদীসভুক্ত বিধায় তার এ কাজটি হারাম হয়েছে।

আল্লাহ যেমন বানিয়েছেন, তেমনই থাক

একবার করলেই খতম–এসব গুনাহ তো এরকম নয়। বরং যেহেতু এসবের দ্বারা মানুষ নিজের নামকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। আর নাম তো একদিনের

বিষয় নয়; বরং আজীবনের একটি বিষয়। তাই এ গুনাহগুলো তার আজীবন হতে থাকে। এজন্যই এ গুনাহকে কাপড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ জাতীয় গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন।

সুতরাং এসব ফুটানির পেছনে না পড়ে আল্লাহ যেমন বানিয়েছেন, তেমনই থাক। নিজেকে বড় হিসাবে জাহির করার বিড়ম্বনা সৃষ্টি করোনা। আল্লাহ যে গুণ দিয়েছেন, তা প্রকাশ কর। আল্লাহ কাকে কী গুণ কেন দান করেন, তা তিনিই ভালো জানেন। সুতরাং প্রকাশ করতে হলে নিজেরটা কর– অন্যেরটা নয়।

আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করুন

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর শিক্ষামালা সত্যিকার অর্থেই অনুপম। তিনি এমন সূক্ষ্ম বিষয়ের শিক্ষাও মানুষকে দিয়েছেন, যা কল্পনাকেও হার মানায়। দেখুন, তাঁর শিক্ষামালার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, দুটি হুকুম এক নয়; বরং ভিন্ন। একদিকে তিনি বলেছেন, যে গুণ ও বিশেষত্ব তোমার মাঝে তা জাহির করার চেষ্টা করোনা। কেননা, এতে অন্যান্যরা তখন ধোঁকায় পড়ে যেতে পারে। অপরদিকে তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন–

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰى اَثَرُ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ –

(ترمذی ، ابوارب الادب، باب ماجاء ان الله يحب ان يرى)

অর্থাৎ– আল্লাহ যে বান্দাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তা তার মাঝে প্রকাশ পাওয়াকে তিনি পছন্দ করেন। যেমন–আল্লাহ তা'আলা এক ব্যক্তিকে রুচি দান করেছেন। এজন্য তাকে ধন-দৌলতও দিয়েছেন। এখন আল্লাহর এ নেয়ামতের দাবী হলো, নিজের ঘরদোর এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যেন 'রুচি' নামক এ নেয়ামত প্রস্ফুটিত হয়ে ভেসে থাকে। গায়ের জামা-কাপড়ও রাখতে হবে দৃষ্টিনন্দন। এ ব্যক্তি যদি জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে থাকে, ঘরদোর অপরিষ্কার রাখে, জামা-কাপড় ময়লা রাখে, তাহলে এটা হবে আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরি।

জনাব! ভালোভাবে বুঝে নিন, আল্লাহ আপনাকে নেয়ামত দিয়েছেন; সুতরাং তা প্রকাশ করুন। ফকির-মিসকিনের মতো থাকলে তো মানুষ আপনাকে যাকাতের উপযুক্ত মনে করে যাকাত দিতে চাইবে।

সারকথা হলো, কৃত্রিমতা নয়; বরং বাস্তবতা প্রকাশ করুন। আল্লাহ যেমন বানিয়েছেন, তেমনই থাকুন। উদারতা কিংবা অপচয়ের দোহাই দিয়ে জীবনকে সত্য ও প্রকৃত অবস্থা থেকে দূরে রাখা কখনই কাম্য নয়। এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

আলেমের জন্য ইল্‌ম প্রকাশ করা

ইল্‌মের ব্যাপারটিও এমনই। এটা আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত। বিনয়ের অর্থ এই নয় যে, আলেম হয়ে নির্জনে বসে থাকবে, যাতে মানুষ তাকে চিনতে না পারে। বরং আল্লাহর এ নেয়ামতের দাবী হলো, এর দ্বারা মানুষকে উপকৃত করা। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার পদ্ধতি এটাই। সুতরাং একে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এটা করতে গিয়েই অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

দুঃশাসন চেনার উপায়

"বর্তমানে যে যত বেশি অন্যকে বিপথে নিতে পারছে, যার নিকট কুরআন-হাদীসের সহীহ জ্ঞান নেই, উপরন্তু সে মূর্খ ও প্রতারক—এমন লোক একটু ধাপ্পাবাজি দেখালেই জনসাধারন তার পেছনে ছুটতে শুরু করে। এরপর সে তাদেরকে নিজের পেছনে ইচ্ছেমতো ঘোরাতে থাকে। সে নিজের পথভ্রষ্ট, মানুষকেও পথহারা করে ছাড়ে। মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে সে মহান পথপ্রদর্শক সেজে বসে। মানুষও দেখেনা কিংবা বোঝেনা যে, কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে তার অবস্থানটা কোথায়?"

দুঃশাসন চেনার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَالسُّفَهَاءِ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ ، فَاَخْبَرَنِىْ اِبْنُ حَسَنَةَ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ مَا اٰيَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ اَنْ يُقْطَعَ الْاَرْحَامُ وَيُطَاعَ الْمُغْوِىْ وَيُعْصَى الْمُرْشِدُ –

(ادب المفرد باب قاطع رحم كى سزا)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

দুঃসময় থেকে মুক্তি কামনা

হযরত সাঈদ ইবনে সাম'আন ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবিঈ। তিনি বলেন, আমি বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে বালক ও নির্বোধদের শাসন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।

এর দ্বারা বোঝা যায়, অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন ও নির্বোধদের হাতে যদি শাসনক্ষমতা চলে যায়, তাহলে মানুষের জন্য তা নিঃসন্দেহে দুঃসময়। তাই সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) উক্ত দু'আ করতেন।

দুঃসময়ের তিনটি আলামত

সাঈদ ইবনে সাম'আন (রহ.) বলেন, তিনি যখন এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এমন দুঃসময়ের আলামত কী? নির্বোধ শাসকের শাসনযুগ চেনার উপায় কী? তিনি উত্তর দিলেন–

اَنْ يُقْطَعَ الْاَرْحَامُ وَيُطَاعَ الْمُغْوِىْ وَيُعْصَى الْمُرْشِدُ –

এমন যুগ চেনার জন্য তিনটি আলামত রয়েছে–

এক. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

দুই. বিভ্রান্তকারীদের অনুসরণ করা হবে।

তিন. কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারীদেরকে উপেক্ষা করা হবে।

যে যুগে উক্ত তিন আলামত পাওয়া যাবে, বুঝে নিবে, সে যুগটাই নির্বোধ ও বালকদের শাসনকাল।

কিয়ামতের একটি আলামত

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্য থেকে একটি আলামত এই–

اَنَ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ –

'নগ্নপদ, নগ্নদেহ, অপরের কাছে হাত পাতে এমন লোক ও ছাগলের রাখালেরা আকাশছোঁয়া ভবন নিয়ে পরস্পরে গর্ব করে বেড়াবে।'

অর্থাৎ– যাদের অতীত ও বর্তমান উভয়টাই কলংকময়। দুর্নীতি ও অসৎ পথে যাদের ব্যাপক আনাগোনা। যারা শিক্ষা থেকে ছিলো অনেক দূরে। এক কথায়–যারা হীন ও ইতর শ্রেণীর, তারাই শাসক বনে যাবে। নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা নিয়ে গর্ব করে বেড়াবে।

কর্ম যেমন, শাসক তেমন

সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.)-এর এ 'প্রার্থনা' থেকে বোঝা যায়, অযোগ্য লোকের শাসক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। যদি কেউ এমন দুঃশাসনের শিকার হয়–যেমনটি বর্তমানে আমরা হয়েছি– তখন তার করণীয় কী?

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মনে রাখবে, তোমাদের অপকর্মের কারণেই তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় অত্যাচারী শাসক।'

যেমন–এক হাদীসে এসেছে–

كَمَا تَكُوْنُوْنَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ

'তোমরা যেমন হবে, তেমন শাসকই তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।'

অপর হাদীসে এসেছে–

اَنَّمَا أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ

তোমাদের কর্ম-কাণ্ডই এক পর্যায়ে তোমাদের শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।'

সুতরাং তোমাদের আমল-কর্ম খারাপ হলে দুষ্ট শাসকগণই তোমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। শব্দভিন্নতাসহ এ মর্মে আরো বহু হাদীস রয়েছে।

এমন সময় আমাদের কী করা উচিত?

এক হাদীসে এসেছে–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের উপর দুঃশাসন চেপে বসবে, তখন শাসকদের মন্দ বলোনা। তাদেরকে গালি দিয়োনা। অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ, ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি শব্দ-তীর দ্বারা তাদের কুৎসা বলোনা। বরং আল্লাহমুখী হয়ে এভাবে প্রার্থনা করো–হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর দয়া করুন। আমাদের বদ'আমলগুলো মাফ করে দিন। আমাদেরকে শুদ্ধ করে দিন। নেক, সৎ, সুনীতিশীল ও খোদাভীরু শাসক আমাদেরকে দান করুন।

দু'আ করার এ পদ্ধতি হাদীস শরীফে এসেছে।

এর মাধ্যমে দুঃসময়ে আমাদের করণীয় কী–তা বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সকাল-সন্ধ্যা শাসকদের গাল-মন্দ না বলে বরং আল্লাহমুখী হোন এবং নিজের অপকর্মগুলো শুধরে নিন।

আমরা কী করছি?

অথচ আমরা এর বিপরীত পথে চলেছি। সকাল-সন্ধ্যা শুধু এই বলে কান্নাকাটি করছি যে, আমাদের শাসক খারাপ। আমাদের ঘাড়ে বসে আছে অযোগ্য শাসকগোষ্ঠি। দু'-চারজন লোক একত্র হলেই এ গল্পে মেতে উঠি। হা-পিত্যেসের তুবড়িতে মুখের ফেনা বের করে ছাড়ি। শাসক ও শাসনের উপর অভিসম্পাত ছুঁড়ি। এসব তো আমরাই করি।

কিন্তু একবারের জন্যও কি ভেবে দেখেছি, আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহমুখী হয়ে কি এ দু'আ করেছি যে, হে আল্লাহ! আমাদের পাপের ফলে আমাদের উপর দুঃশাসন চেপে বসে আছে। আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন। এ দুষ্ট শাসককে হটিয়ে আমাদের জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক দান করুন।

বলুন, আমরা কয়জন এ দু'আ করি। অথচ সমালোচনার জগতে কেউ পিছিয়ে নেই। দিন-রাত শাসকদেরকে মন্দ বলছি। এমন কোনো আসর-আড্ডা নেই, যা এ থেকে মুক্ত। কিন্তু কখনও দুঃশাসন থেকে মুক্তি চেয়ে দু'আ আমরা করিনি।

আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে এই দু'আ করতে পারি। এ দু'আ না করার অর্থ হবে–রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত পথে আমাদের আমল হচ্ছেনা।

অতএব, সমালোচনা নয়; বরং আল্লাহমুখী হোন। নিজের আমলকে শুদ্ধ করুন। আল্লাহর সাহায্য কামনা করে দু'আ করুন। ইনশাআল্লাহ, তিনি আমাদের উপর দয়া করবেন।

আল্লাহমুখী হোন

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার সকল শাসক ও নেতার অন্তর আল্লাহ তা'আলারই নিয়ন্ত্রণে। তোমরা যদি আল্লাহকে খুশি করে তাঁর দিকে ফিরে আস, তাহলে তিনি তাদের অন্তরকে ঘুরিয়ে দিবেন এবং তাদের অন্তরে কল্যাণ সৃষ্টি করবেন। আর যদি এদের মধ্যে কল্যাণ না থাকে, তাহলে এদেরকে হটিয়ে তিনি এদের পরিবর্তে ভালো শাসক দান করেন।

সুতরাং শুধু গালমন্দ আর সমালোচনা দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। বরং আসল কর্তব্য হলো, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তারই দিকে ফিরে আসা। কিন্তু দিলের দরদ নিয়ে খুব কম মানুষই এ কাজটি করে। অথচ একাজ না করলে তো আল্লাহর সাহায্য আসবে না। আমরা আমাদের কাজ করলে আল্লাহ তাঁর কাজ করবেন। তাই সমালোচনা না করে নিজের কাজ করুন। আল্লাহমুখী হোন। দু'আ করুন এবং নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকির করুন।

দুঃশাসনের প্রথম ও দ্বিতীয় আলামত

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দুঃশাসনের প্রথম ও দ্বিতীয় আলামত এই বলেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন ব্যাপকহারে ছিন্ন হবে। অর্থাৎ– আত্মীয়দের অধিকার পদদলিত করা হবে।

তৃতীয় আলামত বলেছেন, পথভ্রষ্টকারীদের ব্যাপকহারে অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ যে যত বেশি গোমরাহ হবে, সাধারণ মানুষের মাঝে তাকে অনুসরণ করার প্রবণতা তত বেশি হবে। বর্তমানে এর বাস্তবতা নিজের চোখে দেখুন। বর্তমানে যে যত বেশি অন্যকে বিপথে নিতে পারছে, যার নিকট কুরআন ও হাদীসের সহীহ জ্ঞান নেই, উপরন্তু সে মূর্খ ও প্রতারক–এমন লোক একটু

ধাপ্পাবাজি দেখালেই জনসাধারণ তার পেছনে ছোটা শুরু করে। এরপর সে জনসাধারণকে ইচ্ছেমতো নিজের পেছনে ঘোরাতে থাকে। সে নিজে পথভ্রষ্ট, মানুষকেও পথ ভ্রষ্ট করে ছাড়ে। মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে সে মহান পথপ্রদর্শক সেজে বসে। মানুষও দেখেনা কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে তার অবস্থানটা কোথায়? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

আগাখানের মহল

একবার সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে একটি চোখধাঁধানো অট্টালিকা পড়লো। আমার সঙ্গের এক ভদ্রলোক বললেন, এটা আগাখানের মহল। লেকের পাড়ের মহলটিকে মনে হলো দুনিয়ার জান্নাত। কারণ, ঐ দেশের ঘর-বাড়ি সাধারণত ছোট-খাট হয়। বড় বাড়ি ও ভবন ঐ দেশের জন্য কল্পনার ব্যাপার। অথচ আগাখানের মহলের ব্যাপ্তি দু-তিন কিলোমিটারের কম নয়। মহলে রয়েছে সবুজ বাগান, লেক, ঝরনা ও বিশাল প্রাসাদ। চাকর-চাকরানির অভাব নেই। তাদের নিকট তো সব ধরনের অশ্লীলতা ও বিলাসিতা বৈধ। মদপানের আসর সব সময় সেখানে জমজমাট থাকে।

আগাখানদের নিকট একটি প্রশ্ন

আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, সবাই তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছে তাদের নেতা বিলাসিতার সাগরে ডুবে আছে। একজন সাধারণ মুসলমানও যেসব বিষয় হারাম মনে করে, তাদের নেতা সেসব বিষয় অনায়াসে রপ্ত করছে। এরপরেও তার অনুসারীরা তাকে নেতা মনে করে কিভাবে?

আমার কথা শুনে আমার এক সঙ্গী বললেন, মজার ব্যাপার হলো, আপনার এ কথাটিই আমি তার এক অনুসারীকে বলেছিলাম। তাকে এও বলেছিলাম, তোমরা যদি একজন নেককার মানুষকে নিজেদের নেতা হিসাবে মেনে নিতে, তাহলে সেটাই হতো বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ তোমরা নেতা বানিয়ে রেখেছ এমন এক ব্যক্তিকে, যে বিলাসিতার সাগরে ডুবে আছে!

আগাখানের অনুসারীর জবাব

আগাখানের ওই অনুসারী তখন আমাকে উত্তর দিলো, আমাদের নেতা তো মহান। তিনি দুনিয়ার এই সাধারণ প্রাসাদগুলোকে পেয়েই তুষ্ট। তার আসল মাকাম তো হলো জান্নাত। কিন্তু তিনি সেই জান্নাতে (!) না গিয়ে আমাদেরকে হিদায়াত করার উদ্দেশ্যে এসেছেন দুনিয়াতে। সুতরাং এটা তো আমাদের জন্য

তার অনেক বড় ত্যাগ। দুনিয়ার এসব নেয়ামত জান্নাতের নেয়ামতের তুলনায় তো কিছুই নয়। অথচ তিনি সেসব নেয়ামত ত্যাগ করেছেন আমাদেরই জন্য।

আসলে হাদীসে এ ধরনের চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে যে, দুঃশাসনের একটি আলামত হবে, স্বচক্ষে দেখতে পাবে লোকটি বিপথে আছে; তবুও মানুষ তার অনুসরণ করবে ব্যাপকহারে।

অনুসরণ করা হচ্ছে ভণ্ডদের

দেখুন, মূর্খ পীরদের আধিপত্যও আজ বেশ রমরমা। তাদের সাম্রাজ্যে গেলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সাজানো গদি, জমজমাট আড্ডা, পানাহারের ধুমধাম তো রয়েছেই, পাশাপাশি রয়েছে নানাপ্রকার বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনাও। এরপরেও এসব মূর্খ পীরের ভক্তের অভাব নেই। ভক্তরা বলে, এ পৃথিবীর বুকে আমার পীর আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের প্রদর্শক।

হাদীসে উল্লেখিত গোমরাহকারী এরাই। মানুষ এদের অনুসরণ করছে। কারণ, এদের হাতে রয়েছে বিভিন্ন ভেল্কিবাজি। যেমন–সম্মোহিত করে কারো হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে দেয়া। কেউবা পীরের 'সোহবতে' ভালো স্বপ্ন দেখে। কেউবা এখানে বসে খানায়ে কা'বাতে নামায পড়ে আসে। আরো কত কী! এসব ভেল্কিবাজির কারণে সাধারণ মানুষ ভণ্ড পীরদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তারা মনে করে, ইনিই মহান পথপ্রদর্শক (!) আসমান থেকে নাযিল হয়েছে! ফলে তিনি যা বলবেন, তা-ই মানতে হবে। হারামকে হারাম বললে, নাজায়েযকে জায়েয বললে তাও মেনে নিতে হবে। দেখার প্রয়োজন নেই শরীয়ত কী বলে। নাউযুবিল্লাহ।

দুঃশাসনের তৃতীয় আলামত

তৃতীয় আলামত হলো, আল্লাহর যেসব বান্দা সুন্নাতের অনুসারী, যাঁরা নিজের জীবনকে শরীয়তসম্মতভাবে চালানোর চেষ্টা রাখেন এবং দ্বীন সম্পর্কে যাঁরা সঠিক জ্ঞান রাখেন, তাদের নিকট কোনো ব্যক্তি এলে কষ্টের কাজ দিবে, ফরয আদায়ের কথা বলবে, নামায পড়ার কথা বলবে, যবানের হেফাযতের কথা বলবে। গুনাহ ত্যাগ করার কথা বলবে এবং বলবে, অমুক কাজ কর আর অমুক কাজ ছাড়। বলবে, সব গুনাহ ছাড়। আর এসব কাজ করতে কষ্ট হয় তাই মানুষ এদের নিকট আসতে চায় না।

মোটকথা, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, বিভ্রান্ত ও গোমরাহ লোকদের অনায়াসে অনুসরণ করা হবে এবং যারা হিদায়াতের সঠিক পথ দেখায়, তাদের অবাধ্যতা করা হবে। তাঁরা যদি বলেন, অমুক কাজ হারাম-করা

যাবে না। উত্তরে বলা হবে, 'আপনি হারাম বলার কে? এখানে হারাম হওয়ার কী আছে? অমুক বিধান আর এ বিধানের মাঝে পার্থক্য কী? যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি 'না' বলছেন, আপনার কথা মানবো না।' উপরন্তু তাঁদেরকে গালি দেয়া হয় এবং বলা হয়, 'মোল্লারা দ্বীনকে কঠিন ও সংকীর্ণ করে ফেলেছে। এদের কারণে বাঁচাও মুশকিল।' এ ধরনের সকল ফিতনাই আমাদের যুগে বিদ্যমান।

ফেতনা থেকে বাঁচার পথ

এসব ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় হলো, আপনি যার নিকট যাবেন, যাঁকে আপনার নেতা বানাবেন, যাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন, সে সুন্নাতের অনুসরণ করে কিনা–সর্বপ্রথম এটা দেখুন। সে কত বৈচিত্র্যময় কারামতি দেখাতে পারে–এসব দেখবেন না। কারণ, অলৌকিক কোনো তেলেসমাতি দেখানোর সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই।

একজন পীর সমাচার

একবার এক পীর সাহেবের একটা পামপ্লেট দেখেছি। সেখানে লেখা ছিলো, 'যে পীর এখানে বসে নিজের মুরিদদেরকে হেরেম শরীফে নামায পড়াতে পারবেন না, সে 'পীর' হওয়ার যোগ্য নয়।" অর্থাৎ যে পীর মুরিদকে সম্মোহিত করে করাচিতে বসে তাকে হেরেম শরীফ দেখানোর ভেল্কি দেখাতে পারে–সেই পীর হওয়ার যোগ্য। একে জিজ্ঞেস করুন, এ জাতীয় কথা কুরআনের কোন আয়াতে আছে কিংবা হাদীসের কোন কিতাবে আছে? সে উত্তর দিতে পারবে না। কারণ, কুরআন-হাদীসে এ ধরনের কোনো কথা নেই।

রাসূল (সা.)-এর তরিকা

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেছিলেন। মদীনায় থাকাবস্থায় বাইতুল্লাহর কথা স্মরণ করে মনের দুঃখ প্রকাশ করতেন। একবার বেলাল (রা.) জ্বরে পড়েছিলেন। তখন তিনি মক্কার কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমার আঁখিযুগল মক্কার পাহাড় দেখতে পাবে কখন? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) একবারের জন্যও তাঁকে বলেননি, আস, তোমাকে মক্কার হারামে নামায পড়িয়ে দিচ্ছি। তাহলে রাসূল (সা.) ও কি শায়খ বা পীর হওয়ার যোগ্য নয়? আসলে পীর হওয়ার জন্য অলৌকিক ঘটনা দেখানো জরুরী নয়। এটা পীর হওয়ার মাপকাঠিও নয়।

হ্যাঁ, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে একটি মাপকাঠির সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সত্তরের অধিক ফেরকা হবে। এরা মানুষকে জাহান্নামের দিকে টানবে। এসব ধ্বংসের পথ। আমি এবং আমার সাহাবারা যে পথে রয়েছে এ পথই একমাত্র জান্নাতের পথ। তোমরা এ পথকে আঁকড়ে ধর।' সুতরাং যে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করে, সে-ই শুধু পীর হতে পারবে।

সারকথা

অতএব কারো অনুসরণ করার পূর্বে দেখুন, সে কী পরিমাণ সুন্নাত মেনে চলে? কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী কতটুকু আমল করে? যদি সে এ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারে, তাহলে তার অনুসরণ করুন। অন্যথায় তাকে এড়িয়ে চলুন। এ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে না পারলে সে যত বড় তেলেসমাতি দেখাক না কেন এবং আপনাদেরকে সম্মোহিত করুক না কেন, তার অনুসরণ করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলুন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেদায়াতের পথ দান করুন এবং গোমরাহি থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

আত্মত্যাগ ও পরোপকারের ফযিলত

"আখেরাতের চিন্তা, আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার বোধ যদি অন্তরে না থাকে, তাহলে সে মানুষটি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন সে দুনিয়াকে একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করে এবং দুনিয়ার পেছনে নিজের সবটুকু যোগ্যতা ব্যয় করতে থাকে। প্রয়োজনে অপরের পেটে লাথি মার আর দুনিয়ার মজাটা লুটে নাও— এ মানসিকতা তার তৈরি হয়। এজন্য ইসলামের শিক্ষা হলো, দুনিয়ার ফিকির নয় বরং সর্বক্ষণ আখেরাতের ফিকির জাগরুক রাখো। এতে অন্তর পবিত্র ও স্বচ্ছ চিন্তা থাকবে।"

আত্মত্যাগ ও পরোপকারের ফযিলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : اِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَهَبَتِ الْاَنْصَارُ بِالْاَجْرِ كُلِّهٖ قَالَ، لاَ، مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ – (ابوداؤد كتاب الادب ، باب فى شكرا المعروف صفحه ٣٠٦)

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, মুহাজির সাহাবীরা হিজরত করে যখন মক্কা থেকে মদীনায় এসেছিলেন, তখন তারা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর দরবারে গিয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনায় আনসারী সাহাবীরা সব সাওয়াবই তো নিয়ে গেলো। আমাদের জন্য কিছুই তো রইলো না? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, তোমরা তাদের জন্য দু'আ করতে থাক। তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক। তাহলে তোমরাও সাওয়াব পাবে।

মুহাজির সাহাবী। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী এক কাফেলার নাম। মক্কাতে যাদের বাড়ি ছিলো। জমি-জিরাত ছিলো। ধন-সম্পদ অর্থাৎ বাড়ি সবই

ছিলো। কিন্তু মদীনাতে আসার সময় এগুলো সব মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। তাই তারা মদীনাতে একেবারে নিঃস্ব ছিলেন। এখন তাদের বাড়ি-ঘরের প্রয়োজন দেখা দিলো। এখন তাদের সংখ্যা তো দু'একজন ছিলো না যে, এর ব্যবস্থা সহজে হয়ে যাবে। তারা তো ছিলেন বিশাল এক জামাত। অথচ তখনকার মদীনা ছিলো ছোট্ট একটি পল্লি। এ ছোট্ট পল্লির মানুষগুলোর কুরবানি দেখুন।

আনসারদের কুরবানি

সে সময়ে মদীনার বাসিন্দা আনসারি সাহাবাদের অন্তরে কুরবানির এমন এক জযবা আল্লাহ তৈরি করে দিলেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের সকল চাবিকাঠি মক্কার মুহাজিরদের জন্য খুলে দিলেন। চাপের মুখে নয় বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁরা মুহাজিরদেরকে বরণ করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিদের্শে নয় বরং নিজ থেকেই তাঁরা ঘোষণা দিলেন। মুহাজিরদের জন্য আমাদের প্রত্যেকের দরজা খোলা। তারা আমাদের পরিবারের লোকের মত। যিনি যে পরিবারে যেতে চান নিসংকোচে যেতে পারেন। তাঁর থাকা-খাওয়াসহ সব ব্যবস্থাই আমরা খুশিমনে করবো। রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারদের এ আবেগ দেখে আনন্দিত হলেন। তাই তিনি মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে দিলেন। বলে দিলেন, অমুক মুহাজির আজ থেকে অমুক আনসারের ভাই। ভ্রাতৃত্বের এ আমেজে সবাই মোহিত হলেন। প্রতিজন আনসারি নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন একজন মুহাজিরকে। এভাবে আনসারি এবং মুহাজির হয়ে গেলেন একই পরিবারে। এমনকি কোনো কোনো আনসারি সাহাবী তখন নিজের ভাগের মুহাজিরকে এ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, আমার স্ত্রী দুইজন। যদি আপনি চান, তাহলে একজনকে আমি তালাক দিয়ে দেবো এবং আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। যদিও এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি, তবে এমন প্রস্তাবও তাঁরা মুহাজির ভাইদের জন্য দিয়েছিলেন।

আনসার ও মুহাজির

এখানেই শেষ নয়। বরং হাদীসে শরীফে এও এসেছে। একবার আনসারি সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুহাজির ভাইয়েরা তো আমাদের সাথেই থাকেন। তাঁরা আমাদের মেহমান। এতে আমরা খুশি। কিন্তু সমস্যা হলো, কিছু কিছু মুহাজির ভাই এজন্য খুব লজ্জাবোধ করেন। জীবিকা উপার্জনের নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা তাদের নেই। তাই তারা কেমন

যেন জড়োসড়ো হয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদের প্রস্তাব হলো, আমাদের সব সহায়-সম্পত্তি পরস্পর ভাগাভাগি করে নেবো। তাদেরকে অর্ধেক দেবো, আমরা অর্ধেক রাখবো। আনসারির এ প্রস্তাবে মুহাজিরদের প্রতিক্রিয়া কী রাসূলুল্লাহ (সা.) তা তাদের কাছে জানতে চাইলেন। মুহাজিররা অসম্মতি জানিয়ে বললো, না এটা হতে পারে না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) সিদ্ধান্ত দিলেন, মুহাজিররা আনসারদের জমি চাষাবাদ করবে। এতে যে ফসল ফলবে, তা পরস্পর ভাগাভাগি করে নিবে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তারা আনসারদের জমি চাষাবাদ করতেন এবং ফসল ভাগাভাগি করে নিতেন।

সাহাবায়ে কেয়ামের ভাবনা দেখুন

অপরকে প্রাধান্য দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান সমাজে সত্যিই বিরল। তাই মুহাজিরদের অন্তরে জাগলো, এর কারণে তো সব সাওয়াব আনসাররা নিয়ে যাচ্ছে। হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমাদের কী হবে? সব সাওয়াব যদি তারা নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? দেখুন, একদিকে মুহাজিররা সাওয়াবের আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অপরদিকে আনসাররা সাওয়াব পাওয়ার নিয়তে নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিচ্ছেন। সাওয়াবের প্রতি এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ছাড়া আর কার মাঝে থাকতে পারে!

তোমরাও সাওয়াব পেতে পার

রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন–

لَامَادَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ

সব সাওয়াব আনসাররা নিয়ে যাচ্ছে তোমাদের এ ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। শোনো, তোমরাও সাওয়াব পেতে পার। তবে এজন্য তোমাদেরকে দু'আ করতে হবে। আনসারদের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে হবে এবং তাদের এই অনুগ্রহের শুক্‌রিয়া আদায় করতে হবে। এর ফলে আল্লাহ তোমাদেরকেও সাওয়াব দিবেন।

কয়েক দিনের দুনিয়া

মুহাজিরদের অধিকার সংরক্ষণ সংস্থা কিংবা আনসারদের অধিকার সংরক্ষণ সংস্থা টাইপের কোনো সংস্থা সাহাবায়ে কেরামের জীবন ছিলোনা। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁরা কোনো আন্দোলন করেন নি। বরং প্রত্যেকের

অন্তরেই ছিলো অপরের উপকার করার এক পবিত্র মানসিকতা। কারণ, তাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভাগাভাগি ছিলো জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন দুনিয়ার অসারতা এবং আখেরাতের সফলতার কথা। দুনিয়াটা তো মাত্র কয়েকদিনের এবং আখেরাত চিরদিনের। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাত চিরস্থায়ী। সুতরাং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা কোনোভাবে পার করে দিলেই হলো। এ পবিত্র চিন্তার ফসলই হলো অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতিযোগিতার ভেতর তারা পরম তৃপ্তিবোধ করতেন।

আখেরাত যখন সামনে থাকে

আখেরাতের ভাবনা, আল্লাহর ভয় আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় যদি অন্তরে না থাকে, তাহলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন দুনিয়াটাকেই মনে হয় একমাত্র কাম্যবস্তু। দুনিয়ার পেছনে এখন সে নিজের সবটুকু যোগ্যতা ব্যয় করে দেয়। প্রয়োজনে অপরের পেটে লাথি মার তবুও দুনিয়া কামাও এ মানসিকতা তখনই তৈরি হয়। তাই ইসলামের শিক্ষা হলো, দুনিয়ার ফিকির নয় বরং আখেরাতের ফিকির কর। তাহলে অন্তর পবিত্র থাকবে। অপরকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা তৈরি হবে। চিন্তা থাকবে স্বচ্ছ।

এক আনসারির ঘটনা

পবিত্র কুরআনে আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে এভাবে–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ○ (سورة الحشر ٩)

অর্থাৎ– নিজেদের প্রচণ্ড প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অপরকে প্রাধান্য দেয়। (সূরা হাশর : ৯)

এক আনসারির ঘটনা। মেহমান এলো তার ঘরে কিন্তু মেহমানকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা নেই। ঘরে সামান্য যা ছিল, তাই তিনি মেহমানের সামনে পেশ করলেন। তারপর ভাবলেন, বিষয়টি মেহমানকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাই খাবার খেতে বসে তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং মেহমানকে এমন ভান দেখাতে লাগলেন যে, তিনি নিজেও খাচ্ছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

উত্তম আমল

সাহাবী হযরত আবুযর (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল কোনটি? উত্তর

দিলেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা আর আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তারপর অন্যজন প্রশ্ন করেছিলো, কোন গোলাম আযাদ করা উত্তম? উত্তর দিলেন, যে গোলামের মূল্য বেশি, সেই গোলাম আযাদ করা উত্তম।

এবার তৃতীয়জন প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ জিহাদ করার মতো কিংবা গোলাম আযাদ করার মতো অবস্থা আমার নেই। আমি অক্ষম ও নিঃস্ব। সুতরাং অধিক সাওয়াব লাভের কোন পদ্ধতিটি আমার জন্য সঙ্গত হবে? উত্তর দিলেন, এমতাবস্থায় তুমি মানুষের উপকার কর, তাহলে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হতে পারবে।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, পরোপকার একটি উত্তম আমল। এর দ্বারা প্রায় জিহাদসম সাওয়াব পাওয়া যায়।

যেমন একব্যক্তি সমস্যায় ভুগছে, তুমি তাকে সহযোগিতা কর। কেউ বিপদে পড়েছে, তুমি তার সহযোগিতা কর। সে আনাড়ি হলে তুমি তার কাজটা করে দাও। হাদীসে 'আনাড়ি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ অনভিজ্ঞ।

শারীরিক অক্ষমতা কিংবা মানসিক দুর্বলতার কারণে হয়ত সে কোনো কাজ বুঝছেনা কিংবা পেরে উঠছে না; তুমি তার কাজটি করে দাও। এতে তুমি জিহাদসম বিশাল সাওয়াব লাভ করতে পারবে।

যদি উপকার করতে না পার

তারপর সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। যদি আমি দুর্বল বা অক্ষম হই, ফলে অপরের উপকার করতে না পারি, তাহলে আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) এবারও নিরাশ করলেন না। এমনই ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী (সা.)। নিরাশা কিংবা হতাশার কোনো ইঙ্গিত তাঁর চলনে-বলনে থাকতো না। আল্লাহর রহমতের আশা তিনি প্রত্যেকের অন্তরে জাগিয়ে রাখতেন। আমলের বিকল্প আমল তিনি উম্মতকে বাতলিয়ে দিতেন।

কারো ক্ষতি করোনা

তাই এবার তিনি উত্তর দিলেন, যদি দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার কারণে কারো উপকার করতে না পার, তাহলে কারো ক্ষতি করোনা। সবসময় লক্ষ্য রাখবে, যেন তোমার কারণে কেউ কষ্ট না পায়। এতেও সদকার সাওয়াব পাবে। কেননা, অপরকে কষ্ট দেয়া গুনাহ। আর এ গুনাহটা যখন তুমি করবে না, তাহলে এর অর্থ হলো তুমি একটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও এক প্রকার সদকা।

মুসলমান কে?

মূলত ইসলামি সভ্যতার মূলকথাই হলো, উপকার করতে না পারলে কমপক্ষে কারো ক্ষতি করোনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه

'প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত ও যবানের অনিষ্টতা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

ইসলামের এ শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ভালোভাবে গেঁথে নেয়া উচিত।

থানবী (রহ.)-এর শিক্ষার সার

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) প্রায়ই একটি শে'র পড়তেন। তিনি বলতেন–

تمام عمر اس احتیاط میں گذری
اشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو

সারা জীবন এ সতর্কতার মাঝে কাটিয়েছি, আমি যেন অপরের বোঝা না হই।

মূলত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর সকল শিক্ষার সার কি ছিলো– এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমি বলি, তাহলে বলবো, তার অর্ধেক শিক্ষার সার ছিলো এই– অন্যকে কষ্ট দিওনা। কষ্ট দেয়ার অর্থ শুধু মারধর করা নয়। বরং বিষয়টি ব্যাপক। কথা ও কাজের মাধ্যমে একজনকে কষ্ট দেয়া যায়। সুতরাং এ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

মুফতীয়ে আ'যম (রহ.)-এর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর একটি ঘটনা এর আগেও আপনাদেরকে শুনিয়েছি। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ওই বছরই রামাযান মাসে অসুস্থতার কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। এভাবেই রামাযান মাসটা কোনোভাবে কেটে যায়। এরপর একদিন তিনি বললেন, একজন মুসলমানের দিলের তামান্না থাকে রামাযান মাসে যেন তার মৃত্যু হয়। আমার অন্তরেও এই তামান্না জেগেছিলো। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে, রামাযান মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে

দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমি তখন বারবার ভেবেছি যে, আল্লাহর কাছে রামযানের ইন্তেকালের জন্য দু'আ করবো। অথচ আমার মুখে এ দু'আটি আসেনি, এর কারণ হলো, হঠাৎ আমার খেয়াল হলো আমি নিজের জন্য রামযানের মৃত্যুর তামান্না করছি। আমি তো জানি আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক। যদি রামাযানে আমার ইন্তেকাল হয়, তাহলে তারা তো আমাকে নিয়ে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে। রোযা অবস্থায় তাদের অনেক কষ্ট হবে। আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করাও তাদের জন্য তখন অনেক কঠিন হবে। এ কারণে আমার মুখে রামাযানের মৃত্যু কামনা করতে দু'আ করাটা আসেনি। তারপর তিনি উক্ত শে'রটি আবার আমাদেরকে শোনালেন। পরবর্তী সময়ে রামাযানের ১১ দিন পর তথা শাওয়ালের ১১ তারিখে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আসলে বুযুর্গদের ভাবনা এমনি হয়।

তিন প্রকারের জন্তু

ইমাম গাযালী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে তিন ধরনের জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এক ধরনের জন্তু আছে, যারা মানুষের শুধু উপকার করে। যেমন গরু, মহিষ, বকরি ইত্যাদি। এসব জন্তু মানুষের অনেক উপকারে আসে। আরেক ধরনের জন্তু আছে, যারা মানুষকে শুধু কষ্ট দেয়। যেমন সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি। এছাড়া তৃতীয় ধরনের জন্তু এ পৃথিবীতে আছে, যারা মানুষের উপকার করে না এবং ক্ষতিও করে না। তারপর ইমাম গাযালী (রহ.) মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মানুষ! যদি তুমি প্রথম প্রকারের জন্তু হতে না পার, তাহলে কমপক্ষে তৃতীয় প্রকারের জন্তু হও। অর্থাৎ মানুষের উপকারও করো না এবং ক্ষতিও করো না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -